ক্যালকাটা বুক ক্লাবের বই

ক্যালকাটা বুক ক্লাবের বই

বাসররাত

ক্যালকাটা বুক ক্লাবের বই

ক্যালকাটা বুক ক্লাবের বই

বাসর রাত

বাসররত

প্রতিভা মৈত্র

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড
৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯

প্রকাশক
নির্মল কুমার সরকার
ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ
৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর
জিতেন্দ্র নাথ বসু
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া
৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদপট
মণীন্দ্র মিত্র

প্রচ্ছদপট ব্লক ও মুদ্রণ
ফটোটাইপ সিণ্ডিকেট
১০, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

দুই টাকা

অধ্যাপক সত্যেন রায়

সুরসিকেষু—

এই গ্রন্থে কাহিনী যা' আছে তা' গল্প হ'লেও সত্যি, এবং সত্যি হ'লেও গল্প।

যেখানে যত চেনা-জানা, আত্মীয়-বান্ধব সবাইকে আজ স্মরণ করি। যারা আছে তা'দেরকে, এবং যে নেই তা'কেও।

—প্রতিভা মৈত্র

ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো। আবছা-নরম একরাশ চন্দ্রিমা। আকাশের দিকে চোখ পড়ে জানলা দিয়ে ; কেমন যেন চক্‌চকে ভাব। আকাশ কত বড়, পৃথিবী অনেক ছোট ! আমার কাছে আজ পৃথিবী বড্ড ছোট হয়ে গেছে, আর, আমারই চোখের সামনে বন্‌বন্ ক'রে ঘুরছে।

চোখে ঘুম নেই আমার : একা জেগে আছি।

আমার এই চন্দন-পরানো কপাল, চেলী-পরা দেহ, থরো থরো মন,—সব মিলে মিশে কেমন যেন অসাড় হ'য়ে গেছে। বিয়ের রাতে নববধূ আমি, শুয়ে আছি স্বামীর পাশে।

স্বামী : আমার জীবন-মরণের সাথী। অনেক মন্ত্র পাঠ ক'রে আজ থেকে তাঁর এই অধিকার। ঘুমুচ্ছেন : আনন্দের ঘুম : প্রাপ্তির আনন্দ : আত্মবিশ্বাসের নিশ্চয়তা। ফুলের মালাটি তেমনি গলায় পরানো আছে। আমিই পরিয়ে দিয়েছি। শুধু পরিয়েই দিইনি, মনে মনেও বলেছি নাকি—'ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্ !'

বাতাস বইছে বাইরে ঃ ফাগুন রাতের বাতাস। মন্দ মৃদু বাতাস এসে ঘরের মধ্যে ঢুকছে। এ-বাতাসের বুকে বুকে আজ কত কথা। কত গানের কথা, কত কথার গান। সব প্রকাশ পাচ্ছেনা, কত কথা গোপন থেকে যাচ্ছে। কত যুগ যুগান্তরের মিলন-বিরহের লাখো লাখো গোপন কথা বসন্তরাতের বাতাসের বুকে গোপন আছে। কত কথাই যে এ-জীবনে গোপন থেকে যায়! এই মস্ত গোল পৃথিবী, আর তার অসংখ্য মানুষের মাঝে যত কথা যতদিন জেগেছে তার সবই যদি প্রকাশ হ'য়ে পড়তো, তবে? এ পৃথিবী শুধু গোল থাক্‌তোনা, সোরগোল হ'য়ে পড়তো! সব কথা কি প্রকাশ পাওয়া ভাল? অনেকদিন ধ'রে অনেক কথাই প্রকাশ না-পেয়ে মনে মনে মরে থাকে। তাই থাক না! তবু তো সে যার কথা তারই। আজকের এই বাসর-ঘরে যত কথা সব তো আমারই! এই বাসরকে ঘিরে যত কথা, যত আনন্দ, যত বেদনা—সবই তো আমার, সবই তো আমাকেই ঘিরে। আজকের দিনের নায়িকা আমি। আজকের এই দিনটির উপরে আমার সর্বময় কর্তৃত্ব। এই দিনটিতে যা' কিছু ঘট্‌লো, সবকিছুরই মূলে ছিলাম আমি। যত আলো জ্বল্‌লো, যত শঙ্খ বাজলো, যত হুলুধ্বনি হোলো পাড়া কাঁপিয়ে, সব তো আমাকেই ঘিরে। ঠিক যেন একটা মস্ত নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছি! সমস্ত দর্শকের দৃষ্টি আজ আমার দিকেই নিবদ্ধ! এত বড় অধিকার আমার

এলো কোথা থেকে ? সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়ে আমি—আজকের এই বিশবছরের বয়সটাতে পৌঁছে কেমন কোরে এসে দাঁড়ালাম এই নাটকের কেন্দ্রলগ্নে,—সেই কথা ভাবতেই আজ সবচেয়ে ভাল লাগছে।

আজই যখন সন্ধ্যেবেলায় সবাই মিলে আমাকে নববধূর সাজে সাজাচ্ছিলো তখন বুড়ি এসে বসেছিলো পাশে! সাজতে চেয়েছিলো আমার মতন কোরে। একটুখানি উশ্‌খুশ কোরে আমার কানে কানে বলেছিলো—'ঠাণ্ডাদি, আমিও সাজবো।' ওর বোধ হয় হিংসে হয়েছিলো আমার সাজগোজ দেখে। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স হোলো, আজও ওর ছেলে-মানুষী গেল না। কারুর বিয়ের দিন এলে আর কথা নেই, বিয়ের ক'নের মতন কোরে ওর সাজতে ইচ্ছে হয়। সেবারে শেফালীদির বিয়ের দিন ওর শখ্ চাপলো শাড়ি পরার। মার অনেককাল আগের বেনারসী শাড়িখানা প'রে হৈ হৈ ক'রে শেফালীদিদের বাড়িতে গেল বিয়ে দেখতে। ফিরে যখন এলো, তখন সে এক দৃশ্য! পরনে শায়া, গায়ে ব্লাউজ্,—কিন্তু শাড়িটি খুলে বগলে নিয়েছে। একটুও লজ্জা নেই ওর! ট্রাম থেকে নামবার সময় নাকি শাড় একটু খুলে গিয়েছিলো: তাই বিরক্ত হ'য়ে শাড়ির বাঁধন থেকে দেহকে মুক্তি দিয়েছে।

অদ্ভুত মেয়ে এই বুড়ি, আমাকে 'ঠাণ্ডাদি' ব'লে ডাকে। কেন-যে অমন একটি নাম ও আমাকে দিয়েছে তা' কেবল

ও ছাড়া আর কেউ জানে না। সাত-আট বছর বয়স পর্য্যন্ত ওকে কখনও জামা পরানো যায়নি ঃ উন্মুক্ত প্রকৃতির হাওয়া ওর সর্ব্বদেহে লাগানোই চাই। ওর কথাই আজ খুব মনে পড়ছে। ছ'সাত বছর আগে একদিন বুড়ি হঠাৎ ব'লে বসলো—"ঠাণ্ডাদির সাথে বিল্লুদার বিয়ে হোক্।" বুড়ির ঐ আরেক রোগ, কাউকেই ঠিকনামে ডাকবেনা ঃ বিমলদাকে বলবে 'বিল্লুদা'। বিমলদা তখন সামনে দাঁড়িয়ে আমারই সাথে কথা বলছিলেন। আমি লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলাম ঃ এক ধমক্ দিলাম বুড়িকে। তারপর থেকে বিমলদা আমাকে প্রায়ই ঠাট্টা ক'রে বল্‌তেন—'কি হেনা, করবে নাকি আমাকে বিয়ে?' আমি রেগে যেতাম খুব, কিন্তু সে রাগ প্রকাশ করার উপায় ছিল না। একে তিনি বয়সে অনেক বড়, তার উপরে কলেজের প্রফেসার!

বাবা ভালবাসতেন বিমলদাকে। বাবার সহকর্ম্মী, অথচ বয়সে দাদার চেয়েও ছোট। যখন প্রথম বিমলদা ঢাকা থেকে এলেন এই কলেজে কাজ নিয়ে, তখন কিছুদিন ধ'রেই বাবার মুখে তাঁর প্রশংসা শুনতাম। বাবা বলতেন মার কাছে, এমন ভাল ছেলে নাকি তিনি আর কখনও দেখেননি! আমার খুব ইচ্ছে হোতো তাঁকে দেখবার। একদিন বাবাকে বল্‌লাম। সেদিন তিনি কলেজ থেকে ফিরবার সময় সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন বিমলদাকে। চা দিতে গেলাম আমি, ভাব হ'য়ে গেল আমার সাথে।

বিমলদাকে যেমন ভয় করতাম, তেমনি ভালও বাসতাম। চিরকালই তাই থাকলো।

আজকের এই রাতের ছোট ঘরটুকুকে ডিঙ্গিয়ে মন চ'লে যাচ্ছে কোথায় সেই আলমনগরে; আমার ছেলেবেলার আলমনগর। আলমনগরের মস্ত কলেজ, আর তার মস্ত এলাকা। সেই কলেজ-এলাকায় আমার শৈশব, কৈশোর কত আনন্দে কেটে গেছে। কলেজের সবচেয়ে দক্ষিণ প্রান্তের বাড়িতে থাকতাম আমরা, আর একেবারে উত্তর প্রান্তের বাড়িতে থাকতেন বিমলদা। একা থাকতেন, একটি চাকরমাত্র সহায়। তাঁর বাড়ির বাগানে একটি কুলগাছ ছিল। বহুকাল আগে, আমি তখন স্কুলে পড়ি,—এক শীতকালের মধ্যাহ্নে ঐ কুলগাছটিকে ঘিরে আমার জীবনে এক দুর্ঘটনা ঘটেছিলো।

কুল-জাতটির ছিল আমাদেম বাসায় প্রবেশ নিষেধ। মার একাগ্র সাধনা ছিল আমাকে গায়িকা ক'রে তুলবার। কুল খেয়ে গলা নষ্ট হবে, অতএব কুল খাওয়া হবে না। অথচ, কুল খাওয়ার জন্য আমার আগ্রহেব অন্ত ছিল না। স্কুলে গিয়ে ক্লাশের মেয়েদের দাক্ষিণ্যে মাঝে মাঝে দু' একটি কুল যদি-বা কপালে জুটতো, তা'তে মন ভরতো না। স্কুলে যেতে হোতো বিমলদার বাসার পাশ দিয়ে। রোজই লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাতাম তাঁর গাছটির দিকে। ইচ্ছে হোতো, টুক্ কোরে একটি ঢিল মেরে দিই: ঝপাঝপ্ অনেকগুলি কুল পড়ুক, কুড়িয়ে নিই!

কিন্তু সে উপায় ছিল না। সংগে ছোটমাসি থাকতো, আর থাকতো আমাদের চাকর নিধিরাম। মনে ভয় ছিল, এমন কাজ করলেই মা টের পেয়ে যাবেন, তখন আর রক্ষে থাকবেনা। অগত্যা, মনের লোভ মনে চেপে রোজ ঐ কুলগাছের পাশ দিয়ে স্কুলে যেতাম, আসতাম।

সেদিন নিধিরামের জ্বর হয়েছে। ছোট মাসিও আর স্কুলে যায় না, তার ফাইন্যাল পরীক্ষা হ'য়ে গেছে। আমি একাই স্কুলে গেছি। ছুটির পরে একাই ফির্ছি ; বারবার মনে ভয় হচ্ছে, কি ভাবে বিমলদার বাসার সামনে গিয়ে লোভ দমন করবো! তাঁর বাসাব কাছে যেতেই প্রথম চোখ পড়লো গিয়ে কুল গাছের উপর। অজস্র টোপাটোপা কুল ধ'রে আছে। দুরন্ত লোভ দুর্নিবার হ'য়ে জেগে উঠলো। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম ঃ কোথাও জনপ্রাণী নেই ঃ পাড়াটি নিস্তব্ধ। সাহস দেখা দিল। টুক্ কোরে একটি ঢিল ছুঁড়ে দিলাম গাছের দিকে। কত-যে কুল পড়লো! বইগুলি হাত থেকে নামিয়ে রেখে প্রাণের খুশিতে কুড়োতে স্থরু করলাম।

ঃ 'কি হেনা, কুল খাচ্ছ ?'

চম্‌কে উঠলাম পরিচিত কণ্ঠস্বরে। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়! পিছনে তাকিয়ে দেখি বিমলদা। কলেজ থেকে ফিরছেন, হাতে অনেকগুলি বই ঃ তাঁর নয়, আমারই রেখে-দেওয়া বইগুলি তিনি তুলে নিয়েছেন। ধীরে ধীরে

এগিয়ে এলেন। আমাব পিঠের উপব সস্নেহে হাত বেখে বল্লেন—

: 'ভেতরে চলো। তোমাকে অনেক কুল পাড়িয়ে দিচ্ছি !'

স্থাণুব মতন দাঁড়িয়ে রইলাম। বিমলদা অনেকবার বল্লেন ভেতরে যাবাব জন্য,—আমি নিরুত্তব। হাত ধ'বে টানতে লাগলেন। আমি মুখ নীচু কোবে শক্ত পাথবের মতন দাঁড়িয়ে বইলাম।

: 'কি হেনা, কি হোলো ?'

একেবারে ঝরঝর্ কোবে কেঁদে ফেললাম আমি। বিমলদা অনেক ক'রে আমাব মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবাব চেষ্টা করলেন। আমি তাঁর কোলে মুখ গুঁজে আবও বেশী কোরে কেঁদে উঠলাম। ভেবে দেখলাম, মা নিশ্চয়ই টেব পেয়ে যাবেন যে আমি পরের বাগানে কুল খেয়েছি হ্যাংলাব মতন। কূল-কিনারা না পেয়ে অবশেষে বিমলদাকে বলে ফেললাম আমার ভয়ের কারণ। শুনে তিনি হো-হো ক'বে হেসে উঠলেন। বল্লেন—'পাগ্লি কোথাকার !'

আমাকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে নিজে এসে বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন। বাড়িতে ঢুক্তে আমার বুক চর্ছর্ করছিলো। মা যদি একবার টের পেয়ে যান তবে আর রক্ষে থাকবেনা : বিমলদা নিশ্চয়ই ব'লে দেবেন। সেদিন রাতে ভাল ক'রে ঘুমুতে পারিনি : অনেকরাত পর্য্যন্ত লেপেব তলায়

শুয়ে ভয়ে কেঁপেছি। মনে মনে বলেছি—"ঠাকুর, তুমি আমাকে রক্ষে কোরো।" বলেছি—"বিমলদা, বোলোনা এ-কথা কাউকে ; আমি চিরকাল তোমার গোলাম হ'য়ে থাকবো।"

পরের দিন স্কুল থেকে যখন ফিরি, দেখি, বিমলদা ব'সে রয়েছেন আমাদের বাইরের ঘরে ঃ বোধ করি বাবার অপেক্ষায় ! আমি ভেতরে যেতেই বাবা এলেন বাইরের ঘরে। আমি সাত-তাড়াতাড়ি বইখাতা পড়ার ঘরে রেখেই চলে এলাম এ-দিকটায়। আমাদের বাইরের ঘরের জানালার পাশেই কতকগুলি ফুলের টব ছিলো। আমরা মাঝে মাঝে সেগুলির যত্ন করতাম। সেদিন আমি অকারণে তখন ফুলগাছগুলিতে জল দিতে স্বরু করলাম। কান রইলো খাড়া হ'য়ে, মন থাকলো বিমলদার ও বাবার কথাবার্ত্তার দিকে। কিছুক্ষণ পরেই বিমলদা চ'লে গেলেন। কিছুই বল্‌লেন না আমার সম্পর্কে : ভারী ভাল লাগলো তাঁকে। সেদিন থেকে একমুহূর্ত্তের জন্যও তাঁর অবাধ্য হইনি।

কিন্তু আজও কি তাঁর বাধ্য আছি। অবাধ্য কি হইনি ? কত ভরসা নিয়ে সেদিন জানতে চেয়েছিলেন আমার মনের গোপন কথাটি। পারিনি তো, পারিনি। এখনও কানে বাজছে সেই কথা—'বলো হেনা, বলো ? চুপ কোরে থেকোনা !' চুপ

করেই থেকেছি, উত্তর দিইনি। তারপরে, আজ আমার বিয়ে,—বিয়ের রাতে এই আমার বাসরঘর। এই বাসরঘরে শুয়েই আজ মনে পড়ছে কেমন কোরে একদিন বিমলদার কাছে নিজের সমস্ত অস্তিত্বকে বিলিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। সেদিন আমার কৈশোর ছিল। কুল খাওয়ার সংবাদ বিমলদা কাউকে বল্‌লেন না দেখে কি খুশিই হয়েছিলাম! বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পরেও যখন বুঝলাম যে বিমলদা কাউকে সে খবর বল্‌লেন না, তখন একটু ধাতস্থ হোলাম। তাঁর সম্পর্কে আমার মনে যেমন বেড়ে গেল ভয়, তেমনি জাগলো শ্রদ্ধা।

একদিন সন্ধ্যেয় আমাদের বাড়িতে যথারীতি সঙ্গীতচর্চ্চার আসর বসেছে: মাষ্টারমশাই এসেছেন। একটি পুরাণো গান গাইবার জন্য তিনি নির্দ্দেশ দিলেন। আমি গাইলাম। গানের শেষে তিনি প্রশ্ন করলেন—

: 'তোমার গলা কেন এত খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে, হেনা?'

আমি কোনও উত্তর দিতে পারলাম না। লজ্জায় মুখ নীচু ক'রে বসে রইলাম। ছোটমাসি হঠাৎ ব'লে উঠলো—"গলা খারাপ হবেনা? কার বাগানে কুল পেকেছে, দিনরাত শুধু সেই দিকেই নজর! গলা ভাল থাকবে কি ক'রে?"

আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। চম্‌কে মুখ তুলে ছোট মাসির দিকে তাকালাম: ছোট মাসি মুখ টিপে হাসছে। ভয় হোলো, তবে কি ছোটমাসি জানতে পেরেছে আমার

সেদিনের কুকীর্তির কথা? কিন্তু কি ক'রে জানবে? এক বিমলদা ছাড়া আর কেউ জানেনা এ-কথা। ভয়ে আমার বুকের ভেতর কাঁপতে থাকলো ক'দিন ধ'রে। কিন্তু ছোটমাসি আর তারপরে কোনও উচ্চবাচ্য করলো না। ভরসা হোলো, তবে বোধহয় ছোটমাসি আন্দাজে ঢিল মেরেছিলো সেদিন!

আরও কিছুদিন পরের কথা।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরছি। দেখি পথে বিমলদা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একটু কাছে যেতেই আমাকে ডাকলেন। নিধিকে বল্লেন— তুমি চলে যাও, আমি হেনাকে পৌঁছে দেবো।' নিধি চলে গেল।

: 'বিমলদা!'

: 'বলো।'

: 'আপনি ব'লে দিয়েছেন?'

: 'কি ব'লে দেবো?'

: "সেদিনের কথা।"

: 'কোন্ দিনের কথা?'

: 'সেই যে সেই কুল?'

বিমলদা হেসে উঠলেন। বল্‌লেন—

: 'কই, বলিনি তো কাউকে!'

: 'বল্‌বেন না তো কখনও?'

মুহূর্ত্তের জন্য কি যেন ভাবলেন বিমলদা। তার পরেই—বল্‌লেন—

: 'না, বল্‌বো না। কিন্তু তোমাকে একটি কাজ ক'রে দিতে হবে।'

: 'কি কাজ বলুন?'

: 'কাউকে বলতে পারবেনা কিন্তু!'

: 'আচ্ছা।'

একখানা নীলখাম পকেট থেকে বে'র করলেন। সেখানা আমাকে দিয়ে বল্‌লেন—''এইখানা তোমার ছোটমাসিকে দেবে, অন্য কেউ যেন-না জানতে পাবে।'

আমি খানিকটা অবাক হ'য়ে গেলাম। যাই হোক, ওঁর আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা তখন আমার ছিলনা। সহজেই সম্মত হোলাম।

বাসায় ফিরে সকলের আড়ালে ছোটমাসিকে খামখানা দিলাম। সেও তাড়াতাড়ি চিঠিখানা নিয়েই ব্লাউজের মধ্যে চালান ক'রে দিলো। আমিও নিশ্চিন্ত। শুধু একটা প্রশ্ন জাগলো মনে: ব্যাপারটা কি? চিঠিখানায় কি আছে? এত লুকোচুরি কেন? বিমলদা বল্‌লেন—'কেউ যেন-না জানতে পারে।' ছোটমাসিও চিঠিখানা নিয়েই চোরাইমালের মতন লুকিয়ে ফেল্‌লো! ভেবে কোনও কূলকিনারা পেলাম না। এ কী রহস্য!

রহস্য আরও জমে উঠলো পরের দিন। স্কুলে যাবার সময় হ'তেই, ছোটমাসি এসে আমার সাথে খুব ভাব করতে সুরু করলো। আমাকে জামা প'রিয়ে দিলো, পাউডার মাখিয়ে দিলো, রঙীন ফিতেটা সুন্দর ক'রে বেঁধে দিল মাথায়। অবশেষে আমাকে প্রশ্ন করলো: 'হেনা, তুই কাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসিস?'

না-চাইতেই অনেকখানি আদর পেয়ে ছোটমাসিকে তখন আমার খুব ভাল লেগে গিয়েছিলো। তাই সহজেই তার প্রশ্নের উত্তরে বল্‌লাম—

: 'তোমাকেই।'

: 'তবে তুই কেন আমার একটা কাজ ক'রে দিস না?'

: 'কি কাজ, বলো।'

ছোটমাসির চোখে-মুখে খুশি উপ্‌ছে উঠলো। একটু হেসে আবার প্রশ্ন করলো—

: 'কাউকে বলবিনা তো?'

: 'না।'

ছোটমাসির বুকের ভেতর থেকে আরেকখানা নীলখাম বেরিয়ে এলো। আমাকে সেখানা দিয়ে বল্‌লো—

: 'স্কুলে যাবার সময় এ'খানা তোর বিমলদাকে দিয়ে যাবি।'

: 'আচ্ছা।'

মুখে বল্‌লাম, 'আচ্ছা; মনের মধ্যে কিন্তু তখন অসংখ্য

জিজ্ঞাসা তুফান তুলেছে। কিছুই বুঝতে পারছি না। বিমলদা আর ছোটমাসির মধ্যে কি-একটা-যেন চল্‌ছে। দুজনেই দু'জনকে চিঠি দিচ্ছে গোপনে। কি সে বস্তু, যা' নিয়ে এদের এত গোপনীয়তা!

তখন বুঝিনি, কিন্তু আজ বুঝি, কি নিয়ে সে গোপনীয়তা। একে প্রকাশ করা চলেনা, এ' অনুভবের বিষয়। আজকে এই যে এমন রাতটিকে জড়িয়ে অসংখ্য অজানা রহস্য উঁকিঝুঁকি মারছে, এর কি কোনও প্রকাশ আছে? আমার মনে আজ যে নানাভাব নানারঙের তরঙ্গ তুলে আমাকে অধীর ক'রে দিচ্ছে, তাকে আমি প্রকাশ করতে পারছি কই? আজকের এই রাতকে যখনি নিবিড় ক'রে ভালবাসবার জন্য মনকে প্রস্তুত করতে যাচ্ছি, তখনই কোথা থেকে একটা শূন্যতার হল্‌কা এসে এই তারায়-ভরা আকাশের গায়ে কালি ঢেলে আঁধার ক'রে দিচ্ছে। যখনি মনে পড়ছে কবির কথা—'বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন'—তখনই মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠছে; মনে হচ্ছে এ' আমার বাসরঘর নয়, এ আমার কয়েদখানা! আবার যখনি দেখছি মালাচন্দন-ভূষিত হ'য়ে একজন আমার স্বামীর অধিকার নিয়ে নিশ্চিন্তে আমার পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন, তখনি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে নিঃসাড়ে একটি সহানুভূতির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চাইছে। মনটা চীৎকার ক'রে উঠছে: চেষ্টা করছে এই বাসরঘরকে নিবিড় ক'রে ভালবাসতে; বলতে চাইছে অপরিসীম

আবেগে—'তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে, রাত্রি যবে উঠিবে উন্মনা হ'য়ে প্রভাতের রথচক্র রবে'।

হায়রে, আমার বিশবছরের জীবন! এ'কে না-পারলেম সুধাপাত্রের মতন ক'রে যোগ্য প্রেমিকের সমুখে ধরতে, না-পারলেম চোলাই-করা-মদের মতন বিত্তবানের গলাভিজানোর কাজে লাগাতে। সুধা-রসিক যদি-বা পেলাম, যোগ্যমূল্য পেলাম না ঃ মূল্য দিয়ে যে নিতে এলো সে দেখবে সুধা আর নেই, থিতিয়ে পান্‌সে হ'য়ে গেছে। সকল শ্রীর অধিকারিনী হ'য়েও আমি আজ হতশ্রী। অভিজিতের অভিশাপেই কি আমার আজ এই দুর্দ্দশা! অথবা আরেকজনের? কিন্তু সে আরেকজন আমাকে অভিশাপ দেবেন কেন? ছাত্রীর সকল অপরাধ মার্জ্জনা করাই কি শিক্ষকের ধর্ম্ম নয়! না, না, তিনি আমাকে অভিশাপ দিতে পারেন না। তবে কি সে অভিজিৎ? আজ সে বেচারীর কথা মনে আসছে কেন? একদিন তাকে কত গালাগাল দিয়েছি। 'স্কাউণ্ড্রেল' ছাড়া অন্য কোন আখ্যাই তাকে আমি দিতে পারিনি। তবু আজ তারই কথা মনে পড়ছে।

সে ছিলো আমার সহপাঠী। প্রবেশিকার দ্বার অতিক্রম ক'রে সবে কলেজে প্রবেশ করেছি, সেই সময়ে অভিজিৎকে দেখি। দেখি বলিনা, বলি—আবিষ্কার করি। পঁচিশে বৈশাখ কবির জন্মদিনের ধারাকে বহন কোরে কেমনভাবে মৃত্যুদিনের

দিকে এগিয়ে গিয়েছিলো। তারই গীতি-আলেখ্য অভিনীত হচ্ছে কলেজে। আশৈশব গীতি-সাধিকা আমি, সমস্ত মন দিয়ে গানের স্বাদ গ্রহণ করার জন্য তৈরী হ'য়ে সভায় গিয়েছি। বেসুরো গান, বেতালা সঙ্গৎ মনকে ক্লান্ত ক'রে তুলেছে। সকলের শেষে আমাকেও সমাপ্তি-সঙ্গীত গাইতে হবে; তাই, বিরক্তি সত্ত্বেও সভা ছেড়ে চ'লে যেতে পারছিনা! অসীম বিরক্তি নিয়ে মনকে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি এখানে-ওখানে। কখন-যে মন আমার ফিরে এসেছে মঞ্চের দিকে, ঠাহর পাইনি। এক সময়ে দেখি সমস্ত শ্রবণ আমার নিবদ্ধ হয়েছে একটি গানের সুরে—'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।' কে সে গায়ক? আমারই সহপাঠী অভিজিৎ চৌধুরী।

অভিজিৎই আমাকে খুঁজে নিয়েছিলো পরের দিন। আমার কণ্ঠে বিদায়ের পাত্রখানি স্মৃতিসুধায় ভরা থাকবার প্রার্থনা নাকি সেদিন মধুর হ'য়ে বেজেছিলো, তাই তার আমার সাথে আলাপ করবার আগ্রহ। আলাপ হোলো, ঘনিষ্ঠতা হোলো, আমাদের পারিবারিক সঙ্গীতআসরের নিয়মিত সভ্য হোলো, আর হোলো আমার বাবার প্রিয়পাত্র।

কিন্তু এই উচ্ছ্বসিত প্রীতির পাত্র বেশীদিন পূর্ণ থাকতে পারলো না। বাইরের চাক্‌চিক্য দিয়ে যে অন্তরের কতখানি কালিমা ঢাকা আছে তা' আমাকে একদিন চোখে আঙুল দিয়ে

দেখিয়ে দিলেন তর্ক শাস্ত্রের অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত। এই তরুণ অধ্যাপকটি ছিলেন আমাদের কলেজের সবার সেরা আকর্ষণ। ইনি শুধু তার্কিক ছিলেন না, ছিলেন শিল্পীও। শিল্পী বল্‌লে ঠিক বলা হয়না, তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে শিল্প-প্রেমিক।

ধানবাদ থেকে একটি মেয়ে এসে আমাদের কলেজে ভর্ত্তি হোলো, নাম অতসী বসু। ভীরু, লাজুক, নরম। তর্কশাস্ত্র বোঝে আমাদের চেয়ে বেশী, সহজেই মণীন্দ্র বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। অতসী নিয়মিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর লিখে অধ্যাপক দত্তকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে আনতো। সেদিনও সে খাতা দিয়ে এসেছে। এক সময়ে বেয়ারা এসে অতসীকে ডেকে নিয়ে গেল। আমরা সবাই ঈর্ষাকাতর দৃষ্টি নিয়ে অতসীর পশ্চাদ্ধাবন করি। মণীন্দ্র বাবু ফিরিয়ে দিলেন খাতা। একটু থেমে বল্লেন—

ঃ 'তোমার কিছু হারিয়েছে ?'

ঃ 'কই না তো ! মনে পড়ছে না।'

ঃ 'ভাল ক'রে ভেবে দেখ।'

অতসী লাল হ'য়ে গেল। ঘেমে উঠলো ভাবতে ভাবতে। মণীন্দ্রবাবু মৃদু হাসছেন। অবিবাহিত তরুণ অধ্যাপকঃ অকারণে অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্য যাঁর মুখে মাখানো থাকে, তাঁকে এমনি সকৌতুক হাসি হাসতে দেখে আমরা চিল্‌বিল্‌ ক'রে উঠলাম। মণীন্দ্রবাবু পকেটে হাত দিলেন। বেরিয়ে এলো

একটি অর্দ্ধসমাপ্ত রুমাল, গায়ে তার সূচীশিল্পের সুন্দর নিদর্শন। মুগ্ধ-বিস্মিত অধ্যাপকের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—

"এত ভালো শিল্পী তুমি! এমন ভালো সেলাই করতে পারো! আমার খুব ভাল লাগছে!"

কলরব ক'রে উঠলাম আমরা। সারা কলেজে খবরটি রটে যেতে পাঁচমিনিট সময়ও লাগলো না। তার পরেই সুরু হোলো ব্ল্যাকবোর্ড-চিত্রণ আর দেওয়াল-কাব্য। লাজুক মেয়ে অতসী: কথা বলতে পারতোনা, শুধু লাল হ'য়ে উঠতো কথায় কথায়। লজ্জায় সে কলেজ ছেড়ে চলে গেল। মণীন্দ্রবাবু বাক্ সংযম করলেন। কখনও কোন ছাত্রীর সাথে আর কথাই বল্‌তেন না।

প্রথম অনেকদিন পরে কথা বলেছিলেন আমার সাথে। বোধ করি বাবার খাতিরেই আমার বেলায় এই ব্যতিক্রম। অভিজিৎ আমার লজিকের খাতাটি চেয়ে নিয়েছিলো। আমি খাতা দিতে একটুও দ্বিধা করিনি। দু'দিন পরে মণীন্দ্রবাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন। মেয়েরা তো অবাক্! মণীন্দ্র দত্ত ডাকছেন একটি ছাত্রীকে!

দ্বিধায় জড়িতপদে গেলাম মণীন্দ্রবাবুর কাছে। প্রশ্ন করলেন—

: 'তোমার লজিকের খাতা কি কোনও ছেলেকে দিয়েছো?'

: 'হ্যাঁ।'

ঃ 'আর কখনও দিওনা।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

অধ্যাপক দত্ত তাঁর কথা ব্যাখ্যা করলেন। আমার খাতাটিকে সম্বল ক'রে অভিজিৎ ছাত্র মহলে এমন সব কথা রটনা ক'রে বেড়িয়েছে যা' আমার মর্য্যাদার পক্ষে হানিকর। ছেলেদের এই বয়সে কোনও মেয়ের সম্পর্কে আজগুবি কথাবার্ত্তা ব'লে পৈশাচিক উল্লাস ভোগ করার প্রবৃত্তি নাকি জাগে! খাতা দেওয়া নাকি সেই প্রবৃত্তির আগুনে ঘৃতাহুতি!

অভিজিতের প্রতি ঘৃণায়-বিরক্তিতে মনটা ভ'রে উঠলো।

সেদিন সন্ধ্যায় বৃষ্টি পড়ছিলো টিপ্‌টিপ্‌ করে। হঠাৎ অভিজিৎ এলো। বাবা ছিলেন না বাসায়। আমিই অতিথির আপ্যায়নের ভার নিলাম। অনেকক্ষণ গল্প হোলো। মনের ভেতরের রাগ প্রাণপণ প্রয়াসে চেপে রাখতে আমার কষ্ট হচ্ছিলো। পরপর দু'টি চায়ের পাত্র নিঃশেষ হোলো। তারপর এক সময় মৃদু-কম্পিত গলায় অভিজিৎ যে-কথা আমাকে বল্‌লো, তা' মনে হ'লে আজও আমার সমস্ত শরীর জ্বলে ওঠে। আমি তাকে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে দরজা দেখিয়ে দিলাম। হয়তো এ' প্রত্যাখ্যান সে আশা করেনি, হয়তো অনেক সম্ভাবনার স্বপ্ন সে দেখতো! সে জান্‌তো না যে আমার মন তখন কোন্ দিগন্ত রেখাকে স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়াচ্ছে! অপমানে-লজ্জায় সেদিন সে কোনও কথা বলতে পারেনি ঃ

পরের দিন লিখে পাঠিয়েছিলো—"এমনি ক'রে আঘাত কাউকে দিওনা। যে আঘাত তুমি আজ আমাকে দিলে সেরকম আঘাত হয়তো একদিন তোমাকেও পেতে হবে।" আজ সে কোথায় আছে জানিনা : জানবার আগ্রহ আমার এতটুকুও নেই। শুধু তার চিঠির কথাগুলি আজ এই রাতে যেন দশদিক থেকে আমাকে আক্রমণ করছে। তার অভিশাপ যে এমন কোরে ফলবান হবে, তা' কি কখনও ভেবেছি ?

আজ মনে হচ্ছে, তার মনের নিভৃততম কোনের গোপন কথাটি যেমন আমার কাছে আদর না পেয়ে গুমরে মরেছে, আজ আমারও মনের গোপন কথাটি যেন তেমনি অনাদৃত রয়ে গেল। অ-প্রকাশের বেদনায় তাই আজ সে এত করুণ, এত পাণ্ডুর ! তবু তা'কে প্রত্যাখ্যান ক'রে আমার এতটুকু অনুতাপ হয়নি ; অনুতাপ আমাব অন্য কৃতকর্ম্মের ফল দেখে। আজই সন্ধ্যে-বেলায় ছোটমাসির চোখ দিয়ে জল ঝরতে দেখেছি। এমন কান্না যে সে কতদিন কেঁদেছে, আর,—আরও কতদিন যে সে কাঁদবে, কে জানে ? কেন এই কান্না ? কে এর জন্য দায়ী ?—আমি।

ওদের কোনও দায় নেই। না ছোটমাসির, না বিমলদার। আমারই কুৎসিত কৌতূহল ওদের সাথে সাথে আমাকেও টেনে নিয়ে গেছে দুঃখের পথে। এই কৌতূহলের মোহেই আমি একদিন ছোটমাসির কাছে লেখা বিমলদার চিঠি অত্যন্ত সঙ্গোপনে,

সন্তর্পণে খুলে পড়েছিলাম। সেদিন আমার এমনতরো কৌতূহল একেবারেই শোভন ছিল না। বয়স ছিল অল্প। বিমলদা-ছোটমাসির পত্রবাহিকার কাজ বেশ নির্ব্বিকার চিত্তেই ক'রে চলেছিলাম। হঠাৎ একদিন ইচ্ছে হোলো—কি আছে সেই চিঠিতে, তা' জানবার জন্য। বিমলদা দিয়েছিলেন চিঠি স্কুল থেকে ফিরবার সময়। বাড়িতে এসে সে চিঠি ছোটমাসিকে না দিয়ে গোপনে খুলে পড়লাম। অবাক্ হ'য়ে গেলাম, মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম, বিভোর হ'য়ে গেলাম। এত সুন্দর ক'রে, এত বেশী ক'রে যে কেউ কাউকে ভালবাসতে পারে, তা' কি কখনও ভাবতে পারি?

নেশায় ধরেছিলো আমাকে। হাঁা, নেশাই বটে। জীবনে কখন-যে কিসের নেশা এসে লাগে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। আজকের এই রাতটিরও কেমন-যেন একটি নেশা আছে। আজ-যে আমার পাশে শুয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে তারও মধ্যে কিসের যেন নেশা ছড়িয়ে আছে। এই যে রাত, এই যে সঙ্গ, এমন যে পরিবেশ—জানিনা তা' কেন মধুর হয়েও মধুর নয়, তিক্ত হ'য়েও তিক্ত নয়, অপ্রার্থিত হ'য়েও অসহ্য নয়! এমনটির যেন কোথায় একটু প্রয়োজন আছে। তাই আকর্ষণেরও অভাব নেই এ'তে। এর আছে তেমনি একটি স্বাদ, যার আস্বাদনে পরিতৃপ্তি নেই, কিন্তু উন্মাদনা আছে।

ঠিক উন্মাদনাও বলা চলেনা। কেমন যেন একটা চাপা স্নিগ্ধ কৌতূহল, একটা রহস্যঘেরা আগ্রহ। এমনি এক কৌতূহল

আর আগ্রহের টানে উপযুক্ত বয়সে পৌঁছুনোর আগেই ছোটমাসি আর বিমলদার পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কার ক'রে ফেললাম। শুধু আবিষ্কার ক'রেই ক্ষান্ত হোলাম না, তাকে মনে মনে জানালাম আমার অকুণ্ঠ অভিনন্দন। অকারণে কেমন একটা আনন্দের বান ডেকে এলো আমার মনে।

তবু সেদিন সে আনন্দকে প্রকাশ করতে পারিনি। মানুষের কোনও আনন্দই কি কোনদিন তার প্রকাশের পথ খুঁজে পায়না! একটা ভয়, একটা চাপা আতঙ্ক মানুষের সব আনন্দ প্রকাশের পথ বুঝি এমনি ক'রে রোধ ক'রে দাঁড়ায়। আমারও আনন্দের মধ্যে একটা ভয় লুকিয়েছিলো। তাই সে আনন্দকে আমি বাইরে প্রকাশ করতে পারতেমনা। যে অপরাধ আমি করে ফেলেছি তা যে কখন কোন্ পথ দিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়বে সেই ভয়েই আমার সব আনন্দকে চেপে রাখতে হোতো। অপরাধীর মন নিয়ে সদা সশঙ্কচিত্তে বিমলদা ছোট মাসির পত্রবাহিকার কাজ নীরবে ক'রে যেতাম।

কিন্তু অপরাধ একবার ঘটে গেলে তাকে বুঝি আর রোধ করা যায়না। তাই বারবার আমি চিঠি পড়তে সুরু করলাম। প্রতি-বারেই আমার হাতে চিঠি এলে আগে আমি সেই চিঠি পড়তাম, তারপরে যথাস্থানে পৌঁছে দিতাম। এমনি ক'রে ধীরে ধীরে আমার চোখ খুল্‌লো। নিজেকে একদিন আবিষ্কার করলাম পরমজ্ঞানের মধ্যে। সে জ্ঞান পুঁথিপড়া জ্ঞান নয়, অনুভূতির জ্ঞান।

কিন্তু সে অনুভূতি আজ কোথায়? অনুভবের চরমমুহূর্ত্ত যখন আজ এই রাতে আমার জীবনে এসে উপস্থিত হয়েছে, আমি তাকে সাদরে আসন দিতে পারছি কই? কেন যে পারছিনা তা খুব ভাল ক'রেই জানি।

এক জনের মন আরেকজনকে পেতে চায়। এই চাওয়াটাই জগতে সবকিছু। এরইজন্য মানুষ চিরকাল যুদ্ধ ক'রে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, তবু থামেনি। ভাবি, যে এ চাওয়া কত মিথ্যে, কত বড় দুরাশা। কই কখনওতো দেখিনি সব-পাওয়ার আনন্দ ঘটেছে কারুর ভাগ্যে! ছোটমাসি চেয়েছিল বিমলদাকে, বিমলদা চেয়েছিলেন ছোটমাসিকে, কিন্তু তবু কেউ কাউকে পেলে না। কেন? একমুহূর্ত্তের ভুলে। বিধাতা বেহিসেবী নন, যা' কিছু সৃষ্টি করেছেন, সব কিছুরই হিসেব অতি নিখুঁত। এমন হিসাব করা সৃষ্টিতে ভুল যদি একবার ঘটে যায় তবে আর তার ভাঙ্গনকে রোধ করে, কার সাধ্য? কিন্তু ভাঙ্গন যে প্রথম ধরায়, তার অনুতাপের বুঝি শেষ থাকেনা!

আমারও অনুতাপের শেষ নেই। বিমলদা-ছোটমাসির মিলিত-স্বপ্নে যে ইমারত গড়ে উঠছিলো, তা'তে প্রথম ভাঙ্গন ধরিয়েছি আমি। যে ইমারত একদিন সুন্দর হ'য়ে লোকচক্ষুর সামনে প্রকাশ পেতে পারতো, তাকে আমিই বোধকরি শূন্যে মিলিয়ে দিয়েছি। যখন বুঝতে পেরেছি যে কী প্রচণ্ড ভাঙ্গন আমি

ধরিয়েছি, তখন, প্রাণপণ চেষ্টায় বাঁধ দিয়ে তা'কে ঠেকাতে গেছি। কিন্তু, সে বালির বাঁধ, ধ্বসে গেছে।

আমি নিজেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না, অপরে কেমন ক'রে করবে ? আমিও তাই চাই, কেউ যেন আমাকে ক্ষমা না করে। আজকেও তেমনি বাতাস বইছে বাইরে,—তেমনি সারা আকাশ জুড়ে চাঁদেব হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে,—সাদা মেঘেব দল তেমনি ক'রে আজও অকারণে চঞ্চল হয়েছে। সেদিনও এরা এমনি ক'রেই মানুষেব অনুভূতিতে দোলা জাগিয়েছিলো : সে দোলা আনন্দের দোলা নয়, উল্লাসের দোলা।

বিমলদা ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে তাঁর বাসায়। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, ছোটমাসিব সম্পর্কে নানা তথ্য আমার কাছ থেকে সংগ্রহ করা। গতকাল যে চিঠি বিমলদা আমাকে দিয়ে ছোটমাসির কাছে পাঠিয়েছিলেন তা' পেয়ে ছোটমাসি কি করেছে, কখন্ পড়েছে, পড়বাব সময়ে মুখ হাসি হাসি ছিল, কি গম্ভীব ছিল—নানান্ প্রশ্ন বর্ষণ করতে থাকলেন বিমলদা। আমি যথাসাধ্য উত্তর দিয়ে চল্‌লাম বানিয়ে বানিয়ে, কারণ চিঠিখানা তখন পর্য্যন্ত ছোটমাসিকে দেওয়াই হয়নি। সে সময়ে বিমলদার কোনও চিঠিই আমি না-পড়ে' ছোটমাসিকে দিইনা। হঠাৎ বাইরে থেকে বিমলদার ডাক এলো। বিমলদা গেলেন অভ্যাগতের সাথে দেখা করতে। ব'লে গেলেন,—'হেনা, তুমি

যেন চ'লে যেওনা, আমি এক্ষুনি আসছি।' বাইরে যিনি এসেছিলেন তাঁর কণ্ঠস্বর আমার অত্যন্ত পরিচিত: এই কলেজেরই অধ্যাপক তারিণীচরণ রায়। ভদ্রলোক অত্যন্ত কথা বলেন, যত কথা বলেন সবই নিজের গুণপনার কথা। সারা-জীবন স্কুল-মাষ্টার ছিলেন, প্রবীণবয়সে কলেজে এসেছেন। উচ্চারণের বিকৃতি ঢাকবার জন্য ইংরেজীকায়দায় বাংলা বলেন। ইংরাজী পড়ান ব'লেই প্রমাণ করতে চান যে ইংরাজী শিখে বাংলা ভুলে গেছেন। বাবা বলেন যে তারিণী রায় নাকি শুদ্ধ বাংলাও বলতে পারেন না, শুদ্ধ ইংরাজীও বল্‌তে শেখেননি। যাই বলুন, একবার বল্‌তে সুরু করলে সহজে থামেন না। বুঝলাম বিমলদার আজ সহজে মুক্তি নেই। কি ক'রে সময় কাটানো যায় তা'ই ভাবতে লাগলাম মনে মনে।

মত্‌লব এসে গেল মাথায়। চিঠি পড়ার নেশায় আমাকে তখন পেয়ে ব'সেছিলো। বিমলদার লেখা চিঠি পড়তে পেলে ধন্যবোধ করতাম নিজেকে। এমন ভাষা, এমন প্রাণঢালা ভালবাসা যে কেমন ক'রে সম্ভব তা' ভেবে অবাক্ হ'য়ে যেতাম। ছোটমাসির উপরে হিংসে হোতো। এমন ভাল লোকটির সমস্ত হৃদয়-মন জয় ক'রে রেখেছে আমার ঐ একরত্তি ছোটমাসি! কি গুণ আছে ছোটমাসির, যার জন্য এমন ভাল, এত বড় মানুষটিকে এমন একান্ত ক'রে জয় করা সম্ভব? এ ফাঁকি, এ প্রতারণা! বিমলদা নিজেকে জানেন না, তাই ছোটমাসির

প্রেমে তিনি নিজেকে এমনভাবে বিলিয়ে দিচ্ছেন! বিছানার উপরে বসেছিলাম। নজরে পড়লো, তোষকের তলা থেকে একখানি খামের একটি কোনা উঁকি দিচ্ছে। চিঠি পড়বার তীব্র নেশা তখনি আমাকে উন্মত্ত ক'রে তুল্‌লো। চারদিক দেখে নিয়ে তোষক তুলে ধরলাম উঁচু ক'রে। অনেকগুলি চিঠি বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পডলো। তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে তুললাম। একখানা খামের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো একটি ছবি। একটি উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ের ছবি: স্মিত হাসি মুখ। কৌতূহল উদ্দাম হ'য়ে উঠলো। তাডাতাডি সঙ্গের চিঠিখানা পড়ে ফেল্‌লাম। বিমলদার মা লিখেছেন, ছবির মেয়েটিকে যদি বিমলদার পছন্দ হয় তবে তার সাথে বিমলদার বিয়ে ঠিক করতে চান।

ভাবনা, ভাবনা এলো মাথায়, চিন্তা এলো মনে,—কি যেন পেয়েছি, কি যেন করতে চাই। বিশ্বসংসার অন্ধকারে ঢেকে থাকলো, তার মধ্যে ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুর মতন জ্বলতে থাকলো ছবির মেয়েটির মুখ। আলো দেখতে পেয়েছি, এই আলো ধ'রেই অধঃপতনের কালো অন্ধকার থেকে আমার বিমলদাকে, আমার ভক্তি-সুধায় ভ'রে দিয়েছি যার অঙ্গ সেই সুকুমার দেবতাকে, উদ্ধার ক'রে আনবো। ভক্ত জেগেছে শয়তানও জেগেছে। বিমলদার জীবন-দেউলে আমি ভক্তিময়ী পূজারিণী, ছোটমাসির জীবন-প্রাঙ্গনে আমি মূর্তিমতী শয়তানী।

ছোটমাসির অভাবিত সৌভাগ্যের দীপ আমি ফুৎকারে নিভিয়ে দেবো। এমন বুকভরা ভালবাসা ভোগ করবে ছোটমাসি? কী আছে তার? কেন তার সংকীর্ণ প্রেমে বিমলদা এমনভাবে নিজেকে তিল্ তিল্ ক'রে বিলিয়ে দেবেন? এতবড় অন্যায় আমি কিছুতেই সহ্য করবোনা! একদিন ছোটমাসির প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম যে আমি তাকেই সব চেয়ে বেশী ভালবাসি। কত-যে ভালবাসি তার প্রমাণ দেওয়া হয়নিঃ সেই পরিচয় দেবার জন্যই আজ এত ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছি। একলহমায় ছবিখানি চালান ক'রে দিলাম জামার মধ্যে। মনে মনে বল্‌লাম—ক্ষমা কোরো বিমলদা! তোমাকে বাঁচাতে চাই। ছোটমাসির সংকীর্ণ প্রেমে তোমাকে সংকুচিত হ'তে আমি দেবোনা। তুমি যে মহৎ, তুমি যে বিরাট, তুমি যে ভালবাসার সমুদ্র! ছোটমাসির ছোটপ্রাণে তোমাকে যে ধরবে না!

বিমলদা ঘরে ঢুকলেন। তারিণীবাবুকে বিদায় ক'রে এসেছেন। আমার বুকের মধ্যে তখন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চল্‌ছে। বিমলদা এলেন অনাবিল হাসিমুখ নিয়ে। বল্‌লেন—"কি হেনা, একা ঘরে ভয় পেয়ে গেছো মনে হচ্ছে?" জোর করে মুখে হাসি টেনে বল্‌লাম—"না, ভয় পাইনি। অনেক রাত হ'য়ে গেল, আমি আজ যাই!"

: "সে কি, এক্ষুনি যাবে?"

: "হ্যাঁ, অনেক দেরী হ'য়ে গেছে।"

ঃ "আচ্ছা, তবে যাও। কাল কিন্তু উত্তর নিয়ে এসো !"

ঃ "দিলে তো আনবো !"

দেবে নিশ্চয়ই। তবে আনবো কিনা তা' এখনই স্থির করা সম্ভব নয়। শয়তান সবে তার জাল বিস্তার করতে সুরু করেছে। কোন্ দিক দিয়ে সে তার জাল গুটিয়ে তুলবে তা' এখুনি নিশ্চয় ক'রে বলা কঠিন।

বাসায় পৌঁছেই লক্ষ্মীমেয়ের মতন পড়ার টেবিলে গিয়ে বসলাম। বুকের মধ্যে তখন 'অজগর গরজে সাগর ফুলিছে'। পড়তে কি পারি ? পড়ায় তখন মন লাগে কোথায় ? একই মননের প্রতিধ্বনি আমার মনের সমস্ত আকাশ জুড়ে,—অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব। বিমলদার হৃদয়ের উপর ছোটমাসির অনায়াস অধিকার, ছোটমাসিকে পাওয়ার জন্য বিমলদার এই হ্যাংলামী—এ'কে আর সহ্য করতে পারি না। বিমলদাকে ছিনিয়ে নিতে হবে।

উঃ ! সেদিনের কথা মনে পড়লে আজ আমার চোখ ফেটে জল আসে। কেন, কিসের উত্তেজনায় সেদিন আমি অতবড় অন্যায় করেছিলুম ? কিসের আশা সেই কিশোর বয়সে আমার অন্তরের অন্তস্থলে বাসা বেঁধেছিলো, জানিনি। শয়তানী প্রকৃতি সেদিন আমাকে দিয়ে চরম নিষ্ঠুরতা করিয়ে নিয়েছে। বিমলদার তোষকের তলা থেকে উদ্ধার করা ছবিটি কৌশলে ছোটমাসির হাতে পৌঁছে দিয়েছিলাম। ছোটমাসির মুখ

মুহূর্তে পাণ্ডুর হ'য়ে গেল : তীব্র বেদনার ছাপ তার চোখে মুখে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। দৃষ্টিভরা সন্দেহ নিয়ে ছোটমাসি সেদিন আমাকে প্রশ্ন করেছিলো—

: "হেনা, ছবিখানা তুই কোথায় পেলিরে?"

: "বিমলদার বিছানার তলায়।"

: "কার ছবি জানিস?"

: "জানি।"

অসীম ব্যগ্রতায় ছোটমাসি প্রশ্ন করলো—

: "কার?"

: "বিমলদার সাথে যার বিয়ে হবে!"

সে দৃশ্য আজও ভুলতে পারি না। বিছানায় উপুর হ'য়ে শুয়ে ছোটমাসি ফুলে ফুলে গুমরে গুমরে কেঁদেছে। একদিন নয়, দু'দিন নয়,—দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তার কান্নার শেষ ছিল না। যখনি অন্য কেউ থাকে, ছোটমাসি জোর ক'রে স্বাভাবিক হয়; যখনি কেউ থাকে না, ছোটমাসির চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরতে থাকে। তা' দেখে আমার অন্তরের শয়তানীটা নীরবে হাততালি দিয়ে হাসে। জয়ের হাসি, জল্লাদের হাসি।

সে জয় মিলিয়ে গেছে, সে হাসি শুকিয়ে গেছে। ঘুমঘোরে অচেতন নিরপরাধ একখানি মুখ আমার পাশে আজ: সে মুখে হাসি ফোটাবার ক্ষমতা আমার নেই। বেচারীর নতুন

জীবনে কত নতুন স্বপ্ন! কি ব'লে নিজেকে উপস্থাপিত করবো ওর সামনে! আমাকে হয়ত ও' আজ তেমনি ক'রে পাশে পেতে চায়, যেমন বিমলদা সেদিন চেয়েছিলেন আমার ছোট-মাসিকে পাশে পেতে। হৃদয়ের বিনিময়ে কতবড় মিথ্যাকে যে বরণ ক'রে নিয়েছে তা' বেচারী জানেনা! 'কবিল কি ভুল হায়রে!'

মনে পড়ে দীপার কথা। দীপা আমার সবার চেয়ে বড় বন্ধু ছিল। যখনি আমার মন খাবাপ হোতো তখনি দীপার কাছে চিঠি লিখতাম। দীপা ছুটে আসতো আমাদের বাসায়। ওকে না হোলে আমার দিন কাটতো না। আলমনগর ছেড়ে যখন আমরা কল্‌কাতায় চলে আসি তখন থেকেই দীপার সাথে আমাব ভাব। কলেজে আমরা একত্র সাথে পড়েছি, খেলেছি, আড্ডা দিয়েছি। থার্ড ইয়ারে যখন পড়ি দীপার তখন বিয়ে হয়। বিয়ের আগে দীপা খুব কেঁদেছিলোঃ সহপাঠী মণিশঙ্করের সাথে সবে তখন তার মনেব আদান-প্রদান সুরু হয়েছে, এমন সময়ে দীপাব বাবা তরুণ এ্যাটর্নি শিবপ্রসাদের সাথে দীপার বিয়ে ঠিক ক'রে ফেল্‌লেন। সংবাদটি দীপাই এসে প্রথম জানায়। বিয়ের আগের দিন ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখি, দীপা দোতলার জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে বড় বাজলোঃ মেয়েটি ভালবেসেছিলো, অথচ সে ভালবাসা মর্য্যাদা পেলো না। আস্তে আস্তে পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে

আল্‌গোছে ওর কাঁধে হাত রাখতেই দীপা চম্‌কে পিছন ফিরলো। ম্লান হেসে বল্‌লো—

: "বল্‌তো হেনা, কি করি?"

: "কি আর করবি বল্? বাপ-মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে যখন পারবি না, তখন বিয়েটাকে মেনে নিতেই হবে।"

: "হ্যাঁ, তাই নিতে হবে।"

দীপার বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুরবাড়িতে চলে গেল সে। ক'দিন পরেই দীপা ফিরে এসেছে শুনে দেখা করতে গেলাম। গেলাম মনে মনে উৎকণ্ঠা নিয়ে,—না জানি কি কাণ্ডই ক'রে বসেছে স্বামার সাথে! বাপ-মার জিদের জন্য বুঝি দু'টি জীবনই দুঃখে ভরপূর হ'য়ে উঠে!

ওদের বাড়িতে পৌঁছুতেই দৌড়ে এসে আমায় অভ্যর্থনা জানালো। বেশ একটু পরিবর্ত্তন হয়েছে ক'দিনেই: আগের থেকে আরও একটু বেশী চঞ্চল, আরও একটু বাক্‌পটু, চলনে-বলনে-মননে আরও যেন একটু বেশী উচ্ছ্বলতা। একটু নিরালায় পেয়ে প্রশ্ন করলাম—

: "কিরে, কেমন লাগছে নতুন জীবন!"

: "চমৎকার।"

শিউরে উঠলাম। নিজের দুঃখটাকে বুঝি এমনি ক'রেই ও' প্রকাশ করতে চায়। বল্‌লাম—

: "সে কি রে?"

ঃ "হ্যাঁ, তাই। দু'টি বলিষ্ঠ বাহুর বাঁধনে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ায় যে কী রোম্যান্স তা' তুই বুঝবিনা হেনা!"

সত্যিই, আজও বুঝিনা, কি রোম্যান্স্ আছে যে কোনও দু'টি বলিষ্ঠ বাহুর বাঁধনে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ায়। দীপাকে দেখেছি ভেতর থেকে, ছোটমাসিকে দেখেছি বাইরে থেকে। ভাবতে পারি কি, ছোটমাসিও দীপারই মতন রোম্যান্সের অনুধাবিকা! ছোটমাসির তখনকার কথা মনে পড়লে আজও আমি নিজের কাছে নিজে কোনও জবাব দিতে পারিনা। বিমলদার ভাবী-বউ এর ছবি দেখবার পরে যে চিঠি ছোটমাসি বিমলদাকে লিখেছিলো তা' আমার কণ্ঠস্থ হ'য়ে আছে ঃ

"আমাকে দিয়ে মজা দেখবার কি প্রয়োজন তোমার ছিল? কেন এ ধাপ্পাবাজী তুমি আমার সাথে খেল্‌লে? আমার এ প্রশ্নের জবাব দেবে কি?"

জবাব ছোটমাসি পায়নি। কারণ, জবাব যাঁর দেবার কথা তিনি এর বিন্দুবিসর্গও জানতে পারেননি। ও-দিকে বিমলদা দিনের পর দিন ছট্‌ফট্ করেছেন ছোটমাসির কাছ থেকে চিঠির উত্তর না-পেয়ে। প্রতিদিন আমাকে দূর থেকে দেখে পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। ভেবেছেন, আমি বুঝি ছোটমাসির কাছ থেকে উত্তর নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু, তাঁর সে ভাবনা ব্যর্থ হয়েছে। ছোটমাসিও প্রতিদিন দুঃখে-বেদনায় ছট্‌ফট্ করেছে।

আমার বুক কতদিন কেঁপে উঠেছে ; কত বড় অন্যায় যে ক'রে ফেলেছি তা' বুঝতে পেরেছি অনেক পরে। কিন্তু সে ভুল সংশোধন করার তখন আর কোনও উপায় নেই। একদিন মরিয়া হ'য়ে বিমলদা ছুটে এসেছেন আমাদের বাসা পর্য্যন্ত ঃ আমাকে ডেকে বলেছেন—"হেনা, তোমার ছোটমাসিকে একবার ডেকে দিতে পার ?" কিন্তু, পরমূহুর্ত্তেই কি যেন ভেবে আবার ফিরে গেছেন। আমার তখন অনুশোচনা সুরু হয়েছে। ওদের পরস্পরের ভুল ভাঙ্গিয়ে দেবার জন্য আমিও তখন উদ্‌গ্রীব।

একদিন বিমলদা এলেন বাবার কাছে। বাবা তখন পূজোয় বসেছেন, ইঙ্গিতে বল্‌লেন বিমলদাকে বসতে বলার জন্য। বিমলদা বসে রইলেন বাইরের ঘরে। মন তখন আমার অস্থির ঃ কখনও ইচ্ছা হয় বিমলদা-ছোটমাসির সাক্ষাৎ করিয়ে দিই, ওদের যন্ত্রণার অবসান হোক ! আবার কখনও ভাবি ঃ সাক্ষাৎ যদি ঘটে তবে আমার কু কীর্ত্তি সব ধরা পড়ে যাবে, আমি তখন মুখ দেখাবো কি ক'রে ? ভেবে কোনও কূল-কিনারা পেলাম না। অবশেষে বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। বিমলদার এত কষ্ট আর সইতে পারি না। না-হয় ধরাই পড়বো, না-হয় বিমলদার কাছে আর মুখ দেখাবোনা, তবু তাঁর এ কষ্টের অবসান হোক ! ছোটমাসিকে পেলে যদি ওঁর জীবন সার্থক হয়, তবে তা'ই হোক। বাইরের ঘরে গিয়ে বিমলদাকে বল্‌লাম—"বিমলদা, ছোটমাসিকে ডেকে দেবো ?"

খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তার পর বল্‌লেন—"দাও।"

ছোটমাসি তখন পাশের ঘরে, উৎকর্ণ হ'য়ে শুনছিলো আমাদের কথা। আমি তাঁকে ডাকতে যাওয়া মাত্রই বাজ-পাখীর মতন আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো,—গুম্‌ গুম্‌ কোরে কতকগুলি কিল্‌ বসিয়ে দিলো আমার পিঠের উপরে,—ভেঁউ ভেঁউ করে কেঁদে ফেল্‌লো,—আর্ত্তনাদ ক'রে বল্‌লো—

ঃ "কে বলেছিলো তোকে ওকালতি করতে? কেন তুই সাধতে গেলি? বল্‌গে যা, আমার শরীর খারাপ, আমি যাব না।"

ছোটমাসির হাতে মার খেয়ে হজম করা আমার পক্ষে যদি-বা সম্ভব, তবু বিমলদার কাছে গিয়ে ছোটমাসির অসম্মতির কথা তাঁকে জানানো তখন আমার পক্ষে অসম্ভব। পিছনের দরজা দিয়ে বাগানের মধ্যে পালিয়ে গেলাম: দুঃখে-অভিমানে আমার চোখ ফেটে জল পড়লো। বুঝলাম, ছোট-মাসি আর বিমলদার মধ্যে এই ভুল আর ভাঙ্‌বার নয়। ঘটিল কি ভুল হায়রে!

এ ভুলের সৃষ্টি আমারই হাতে। সারাজীবন ধ'রে চেষ্টা ক'রেও এ ভুলের মাশুল যোগানো হ'য়ে উঠবেনা। ফুলের মালা দিয়ে যে তরুণ ডাক্তারটিকে আমি আজ বরণ ক'রে নিলাম, সে জানবেনা যে আরেকজনের মনের গভীরে কি নিদারুণ

ক্ষতের সৃষ্টি করে ছিলাম এই আমিই, অতি অল্প বয়সে। মেডিকেল কলেজের সেরা ছাত্র এই অবনীশ। মানবের দেহ-যন্ত্রের কোনও রহস্যই নাকি এর অজানা নেই। হায়রে, দেহের রহস্যে যার অনায়াস-অধিকার, মনের রহস্যের সে কোনদিনই নাগাল পাবেনা। কিন্তু তা' যদি না হোতো! যদি দেহ ও মন—উভয়েরই রহস্য ওর চিকিৎসা-শাস্ত্রের আওতার মধ্যে থাকতো, তবে? তবে কি হোতো তা' যে ভাবতেও পারি না।

কি-ই বা ভাবতে পারি! পৃথিবী ঘুরছে: ছোট্ট গোল পৃথিবী আজ আমার চোখের সামনে বন্‌বন্ ক'রে ঘুরছে। সেই ঘূর্ণীর মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে আমার আজকের সারাদিনের ইতিহাস। গত কয়েক ঘণ্টার কাহিনী মনে পড়ছে: কত অদ্ভুত, কত আশ্চর্য্য! আলো জ্বল্‌লো, সানাই বাজলো, হুলুধ্বনিতে মুখরিত হোলো আমাদের বিবাহ-অঙ্গন। আমার নরম হাতখানিকে তার শক্ত মুঠির মধ্যে ধ'রে তরুণ ডাক্তার অবনীশ অনায়াসে শপথ নিলো যে আমার জীবন-সত্তার পরিপূর্ণতম মিত্র সে আজ থেকে। আর আমি? আমিও তো, সেই শপথই নিয়েছি! আমার চেতনার প্রবাহে এতদিন যাকে ধ'রে রেখেছিলাম সেই কি এলো আজ নূতন রূপ ধ'রে?

বিয়ের পরে যখন এই বাসরঘরে এনে আমাদের তোলা হোলো, রসিকতার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে সঙ্গিনীরা যখন ক্লান্ত হ'য়ে

ঘরত্যাগ করলো, সারাদিনের অশ্রান্ত কলরব যখন নীরবতার কোলে আত্মগোপন করলো,—অবনীশ অতিমৃদু, অতিমধুর স্বরে ডাকলো—"হেনা!" সে আহ্বানের মধ্যে কতখানি আন্তরিকতা জড়ান ছিলো তা' ভাবলে আমার সারাদেহ ভয়ে কেঁপে ওঠে! ঐ আন্তরিকতা দিয়েই ও' বুঝি আমাকে জয় ক'রে নেবেঃ ওরই কাছে বুঝি একদিন হার মান্‌বো! হায়রে, কি চেয়েছি, কি হয়েছে! ছোটমাসির কথাই আজ বারবার মনে পড়ে। তাকেও বুঝি তার স্বামী বিয়ের রাতে এমনি ক'রেই ডাক দিয়েছিলেন! ছোটমাসি তখন কেমন ক'রে উত্তর দিয়েছিলো ভেবে পাইনা। বোধকরি, আমারই মতন কোরে। আজকের এই রাতে সেদিনের ছোটমাসির সাথে বর্ত্তমানের আমার কোনও প্রভেদই নেই!

কেমন যেন খাপছাড়া ভাবে হঠাৎ একদিন ছোটমাসির বিয়ে হ'য়ে গেল। রূপের অন্ত ছিলনা ছোটমাসির, দুধ-আল্‌তার রঙ্ ছিল গায়ে। শিবের তপস্যায় আহার ত্যাগ করেছিলেন পার্ব্বতী, তবু দেবাধিদেব রইলেন উদাসীন। পার্ব্বতীর কঠিন তপশ্চর্য্যার নিবৃত্তি নেইঃ গাছের পাতা খেয়ে জীবনধারণ করছিলেনঃ শিবলাভের সাধনায় পর্ণগ্রহণেও হ'লেন বিরতা। তবু রূপ গেলনা তাঁর। অপূর্ব্ব-সুন্দর তাঁর রূপের জ্যোতি কালিদাসের কাব্যে ছড়িয়ে আছে। আমার ছোটমাসির জীবনেও যেন সেই পার্ব্বতীরই প্রতিচ্ছবি। বিমলদাকে ভুল

বুঝে শোকাঘাতে জর্জ্জরিতা : মন ভ'রে উঠেছে মরুভূমির শুষ্কতায় : তবু রূপ যায়নি তার। সে রূপ কি কারুর অ-পছন্দ হ'তে পারে? একলহমায় ছোটমাসিকে পছন্দ ক'রে ফেল্‌লেন বীরনগরের বিত্তশালী মিল মালিক। কিসের যেন ফ্যাক্টরী আছে তাঁর বিশাখাপত্তমে। পুত্রের জন্য ছোটমাসিকে মনোনীত করলেন : অধীর হ'য়ে উঠলেন বিয়ের দিন ঠিক করার জন্য। ছোটমাসি বিন্দুমাত্র আপত্তি করলো না, নীরবে হোলো সম্মতা ধনীপুত্রের গৃহিণী হ'তে। কে জানে কোথায় আত্মগোপন করলো সব আবেগ, সব ব্যক্তিত্ব। এমনি ক'রেই বুঝি নিজের উপরে নিজে প্রতিশোধ নিতে চায় সে। দু'জনের জীবন-সমুদ্র মন্থন ক'রে যে হলাহল আমি তুলেছি তার একটি বিন্দুও কি আমাকে স্পর্শ কর্‌বেনা? সবই কি যাবে ওদের দু'জনেব জীবনের উপর দিয়ে?

মেয়েদের একটা বয়স আছে, যে বয়সে কোথা থেকে এক বিস্ময়কর অনুভূতি এসে মনকে জুড়ে ব'সে থাকে, অথচ তা'কে প্রকাশ করা সম্ভব হয়না। অনেক কিছু বুঝেও কিছু না-বোঝার ভান কর্‌তে তাই মেয়েরা এত পটু। আমি মনে মনে জানছি কতবড় দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে ছোটমাসির বিয়েকে কেন্দ্র ক'রে,—অথচ, সে দুর্ঘটনাকে রোধ করা, কিংবা তার সম্ভাবনার কথা প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসাধ্য, অসম্ভব!

তাই, কোনো বাধা এলনা। দু'টি নতুন চোখের দৃষ্টির

সাথে ছোটমাসির দৃষ্টি-বিনিময় হ'য়ে গেল নির্ব্বিবাদে। বড়-লোকের ছেলের বিয়ে, জাঁকজমকে সমস্ত কলেজ-এলাকা কেঁপে উঠলো। অন্তরীক্ষে প্রেমের দেবতা বুঝি পরাজয়ের বেদনায় একবার না-কেঁপে পারলেন না। মানুষে মানুষে সোরগোল, অন্তরে অন্তরে কানাকানি। বাড়িতে তিলধারণের স্থান নেই : আলমনগরের প্রতিটি নরনারী এসেছেন বিবাহে নিমন্ত্রণে। সেই বহু-মানুষের সম্মিলনে একটি মানুষকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলনা, কিন্তু তাঁরই জন্য প্রাণ আমার কেঁদে উঠলো, তাঁকেই একবার দেখবার জন্য ছুটে গেলাম। পিছনে পড়ে রইলো আলোক-সজ্জিত, কোলাহল-মুখরিত বিবাহ-আসব। আমি চ'লে এলাম বিমলদার বাসায়।

বিমলদার ঘরের ভেতরে আগুন জ্বলছে। বাইরে থেকে শিখা দেখতে পেলাম। কিসের আগুন? জানলা দিয়ে উঁকি দিলাম : কতকগুলি কাগজ জ্বল্‌ছে দাউ দাউ ক'রে : বিমলদা আগুনের সামনে বসে আছেন স্তব্ধ-গম্ভীর হ'য়ে : মাঝে মাঝে একটা ক'রে কাগজ সে আগুনে ফেলে দিচ্ছেন—অগ্নিশিখা নূতন উৎসাহে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠছে। ধীর পায়ে বিমলদার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। চোখ তুলে চাইলেন একবার। আবার সুরু করলেন আগুনে কাগজ দিতে : দেখলাম, শুধু কাগজ নয়, সব ছোটমাসির লেখা চিঠি। আবার একবার ফিরে তাকালেন আমার দিকে। শুক্‌নো হেসে বললেন—

ঃ "এগুলো সব তুমিই এনে দিয়েছিলে, না হেনা ?"

কি উত্তর দেবো ? কোন কথাই এলোনা আমার মুখে। থাকতে পারলাম না ওখানে। ফিরে আসবার জন্য পা বাড়ালাম। বিমলদা আবার বল্‌লেন—

ঃ "কি হেনা, চলে যাচ্ছ নাকি ? এসো মাঝে মাঝে।"

যাব। কেমন ক'রে যাব ? কোন্‌পথ দিয়ে যাব ? যে-পথ দিয়ে যাওয়া যায় সে পথের মাথায় যে ছোটমাসি দাঁড়িয়ে আছে সদা-জাগ্রত প্রহরীর মত। মাঝে মাঝে যাওয়া তো দূরের কথা, একবারও কি যাওয়া সম্ভব ?

সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়ে আমি, আজ হয়েছি বিবাহ-বাসরে নববধূঃ সেদিনের সেই তরুণ অধ্যাপক, আজ হয়েছেন অনতি-প্রৌঢ় সাংবাদিক। অধ্যাপনার জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন বেশ কিছুদিন আগে। এক অজ্ঞাত ছাত্রের পৈশাচিক উল্লাস তাঁর অধ্যাপনাবৃত্তি ত্যাগ করার মূলে। বাংলা দেশ ভাগ হ'য়ে গেল। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে নারকীয় দ্বন্দ্ব দেশজুড়ে প্রবল বীভৎসার সৃষ্টি করেছিলো। সেই বীভৎসার নিবারণ করতে গিয়ে সমস্ত দেশটাকে জোর ক'রে দু'খণ্ড ক'রে দেওয়া হলো। শুনলাম আমাদের চলে যেতে হবে। আমার শৈশবের আলমনগর চিরতরে ছেড়ে যেতে হবে। চলে এলাম এই কল্‌কাতায়। কল্‌কাতার এই কলেজটিতে বাবা শুধু একাই এলেন না, আরও অনেককে সঙ্গে নিয়ে এলেন। সত্যেন গুপ্ত

এলেন, প্রফেসার দাস এলেন, আর এলেন বিমলদা। এই কলেজেরই ছাত্রী হোলাম আমি। প্রথম প্রথম খারাপ লাগতো। কোথায় সেই আলমনগরের বিরাট কলেজ, আর কোথায় এই গুদামঘর! কল্‌কাতায় একপ্রান্তে যুদ্ধের কাজে তৈরী করা টিনেব গুদাম কলেজের কাজ চলে। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মতন ছট্‌ফট্ করি মনে মনে।

কোন ক্লাশই ভাল লাগেনা, ভাল লাগে শুধু বিমলদার ক্লাশ। স্বপ্নের দেশে ভেসে যাই: নির্ব্বাক হ'য়ে চেয়ে থাকে ক্লাশের সবক'টি ছেলেমেয়ে: ইংরাজীর অধ্যাপক অনর্গল বক্তৃতা ক'বে যান। না, না, বক্তৃতা নয়: গান করেন, কবিতার গান: প্রাণ ছুটে যায় কোথায় কোন্ নিরুদ্দেশে। সব হারিয়ে যায়, থাকে শুধু জেগে অধ্যাপকেব মুখ: কালোচুল অনাদরে এসে কপালে লুটায়, বঙ্কিমভঙ্গী দেহ, উজ্জ্বল আয়ত চোখে স্বপ্নেব ছায়া,—আর অতি গম্ভীর, অনতি-মৃদু, নরম নরম কথা:

The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow.

স্তম্ভিত হ'য়ে চেয়ে থাকি: অবাক হ'য়ে শুনি: বাসায় ফিরে এসে ভাবি তখন আর কিছুই মনে পড়েনা। শুধু কানে বাজে "The desire of the moth for the

star, of the night for the morrow." বিমলদা বুঝি আর বিমলদা থাকেন না : তন্ময়তার অতলগভীরে গিয়ে আপন সত্তাকে হারিয়ে ফেলেন। এমন তো ছিলেন না। আলমনগরে তো বিমলদার এত সুখ্যাতি শুনিনি। কলেজের সব ছেলেমেয়ের মুখেই যে এখন বিমলদাব কথা! নতুন কলেজে তাঁর বুঝি ভাল লেগেছে, তাই নতুন উৎসাহে পড়াচ্ছেন! তবে কেন এ কলেজকে আমার ভাল লাগছেনা! কেন সেই আলমনগরের জন্য প্রাণ কাঁদে?

বিমলদারও প্রাণ বুঝি কেঁদেছিলো সেদিন। তবে, সে-কান্না আলমনগরের জন্য নয়। কার জন্য তা' তো আমিই জানি। সেদিন বিমলদার ক্লাশ আরম্ভ হয়েছে একটু দেরীতে। টেনিসনের কবিতা পড়াচ্ছেন। সমস্ত ঘরেব বাতাস কাঁদছে তাঁর কথার প্রতিধ্বনিতে:

Dear as remembered kisses after death,
And sweet as those by hopeless fancy feign'd
On lips that are for others ; deep as love,
Deep as first love, and wild with all regret ;
O Death in life, the days that are no more.

কোন্ সুদূরে ফেলে-আসা-দিনের বেদনা আজ বিমলদার বুক ভ'রে দিয়েছে: অতীতের কোন্ অস্পষ্ট-কুহেলী-মাখানো জীবনে ফিরে গেছে মন: নির্ব্বাক হ'য়ে বসে আছে ঘরভরা

ছাত্র-ছাত্রী। কবিতার অর্থ বুঝছে তারা, নিরুদ্ধ-প্রাণের কান্না শুনছি আমি। ঘণ্টা বেজে গেছে কখন। এতটুক সাড়া নেই অধ্যাপকের : তন্ময় হ'য়ে গেছেন তিনি টেনিসনের কবিতায়। সেই টেনিসন : Men may come and men may go : সেকি মরেছে? না, He remains for ever : আজকের এই মুহূর্তে বিমলদার প্রাণের মধ্যে বসে গান করছে টেনিসন, দুঃখের গান—বেদনার গান।

: "আপনি বিয়ে করেননি কেন, স্যার?"

বজ্রপাত! নিষ্ঠুর বজ্র আঘাত হান্‌লো নরম মাটির বুকে : চৌচির হ'য়ে ফেটে গেল মাটি। সমস্ত ক্লাশে তুমুল সাড়া : কার এ প্রশ্ন? মুহূর্তে বই বন্ধ হ'য়ে গেল বিমলদার হাতে। চোখ উঠলো ছল্‌ছলিয়ে। মাথা নীচু ক'রে বেরিয়ে এলেন ক্লাশ থেকে। পিছনে পিছনে উঠে এলাম আমরা। আমি তাকাই দীপার দিকে, দীপা তাকায় রাকার দিকে, রাকা তাকায় রেবার দিকে : সকলেই ভাষা ভুলে গেছি।

সেদিন আর কোনও ক্লাশ নিলেন না বিমলদা।

পরের দিন সকালবেলায় নতুন একখানা গল্পের বই

পড়ছি বসে বসে। গল্প খারাপ হোক আর ভাল হোক, নতুন বই পেলে আমার আর কথা নেই : নতুন বইএর গন্ধ শুঁকতেও আমার তখন ভাল লাগে। বুড়ি এসে জ্বালাতে সুরু করলো—

: "ঠাণ্ডাদি, ওঠো শীগ্গীর।"

: "কেন ?"

: "চা করতে হবে।"

. "মাকে বলোনা কেন ?"

: "মা-যে বাথরুমে।"

বিরক্ত হ'য়ে প্রশ্ন করলাম—

: "কে এখন চা খাবে ?"

: "বিল্লুদা এসেছেন।"

বিমলদা এসেছেন। না-জানি কালকের ক্লাশের ঘটনায় কত লজ্জা পেয়েছেন। তাড়াতাড়ি চা বানিয়ে বুড়ির হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। কৌতূহল হোলো বিমলদাকে দেখবার। নিজেকে আড়াল ক'রে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। বিমলদা বসে আছেন গম্ভীর হ'য়ে। বাবা প্রশ্ন করছেন বিমলদাকে—

: "কলেজের কাজটা ছাড়বে কেন বিমল ?"

: "ভাল লাগছেনা।"

: "খুব তো নাম-ডাক শুনি তোমার। তবে আবার ভাল লাগছেনা কেন ?"

: "নাম-ডাক দিয়ে কি করবো? অধ্যাপকের জীবন কৃত্রিমতায় ভবা; যা' প্রাণ চায় তা' চক্ষু চায়না। এমন জীবন আমার সইবেনা। আমি এ-কাজ ছাড়বোই।"

: "এতদিন অধ্যাপনা ক'বে আজ তোমার খারাপ লেগে গেল?"

কেন-যে আজ খারাপ লাগছে তা' তুমি কেমন ক'রে বুঝবে বাবা! তোমবা তো দেখো বাইরের চেহারা, আমি-যে বিমলদাকে ভেতব থেকে চিনে ফেলেছি!

সত্যিই কি চিনেছি? তা' কি সম্ভব কখনও? কোনও মানুষকেই কি সম্পূর্ণ ক'রে চেনা সম্ভব? কেউ কি কখনও পাবে চিনতে? আজ যে আমার বাসরসঙ্গী, আমার সারা-জীবনের সঙ্গী হোলো যে আজ থেকে, সে কি চিনবে কখনও আমাকে, আমাব ভেতরের মানুষকে? আমি নিজেই কি নিজেকে চিনেছি?

বিমলদা চলে গেলেন কলেজের চাকুরী ছেড়ে। সংবাদপত্রে কাজ নিলেন। মন খারাপ হোলো, শুধু আমার নয়,—কলেজের সকলেরই মন খারাপ হোলো। যে শয়তান সেদিন ক্লাশে অমন একটি ইতর প্রশ্ন বিমলদাকে ক'রে বসেছিলো, তার কি একটুও মনখারাপ হোলো না? আশ্চর্য্য তার আত্মগোপনের ক্ষমতা। কেউ কি বুঝতে পারলোনা কে সেই প্রশ্নকর্ত্তা? যারা বুঝতে পেরেছে তারা হয়তো বল্‌বেনা কোনোদিন।

ছেলেদের মধ্যে কতরকম শয়তান যে থাকে তার আর ইয়ত্তা নেই। শয়তান ছেলের কথা মনে হ'লেই সব আগে মনে পড়ে নিবারণ প্রামানিকের কথা। বামনেরও চাঁদ ধরার সাধ হয়! হয়তো সবটাই শয়তানী নয় ঃ হয়তো সত্যিই আন্তরিকতা ছিল! কিন্তু মানুষের মন তো মোটরগাড়ির এঞ্জিন নয়, স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ইচ্ছামতন তার গতি-পরিবর্ত্তন করা যায় না। রাকার মনের গতিও পরিবর্ত্তিত হয়নি এতটুকু। কিন্তু কি দুঃসাহস ঐ নিবারণের! রাকা ছিল আমারই সহপাঠিনী, আর নিবারণ পড়তো একক্লাশ উপরে।

মেয়েদের ওয়েটিংরুমে ঢুকেছিলো নিবারণ। সেদিন আমরা সত্যেনবাবুর ক্লাশে গেছি; নিজের নিজের বইখাতা রেখে গেছি ঘরে। দরোয়ান মিহিরলাল বোধকরি ঘুমিয়ে পড়েছিলো, সেই সুযোগে নিবারণ ঢুকেছে মেয়েদের ঘরে। রাকার খাতার মধ্যে রেখে গেছে চিঠি। ক্লাশ থেকে ফিরে খাতার ভিতরে সেই চিঠি দেখে রাকার মুখ কালো হ'য়ে গেল। নীলকাগজে সুন্দর ছাপার হরফের মতন লেখা। কবে কোন্ কোজাগরী পূর্ণিমায় নিমন্ত্রণ খেতে নিবারণ নাকি গিয়েছিলো রাকাদের বাসায়। মেয়েটি তা' জানেও না ঃ অথচ সেইদিন থেকেই নাকি নিবারণের প্রাণ রাকার প্রত্যাশায় ঘরকে বাহির এবং বাহিরকে ঘর করছে। ভয়ে,

ক্রোধে, লজ্জায় কেঁপে উঠলো রাকা। অসহায়ের মতন প্রশ্ন করলো আমাকে—

: "কি করি হেনা ?"

: "প্রিন্সিপ্যালের কাছে নালিশ ক'রে দিয়ে আয়।"

তা'ই করেছিলো, ফল কি হয়েছিলো তা' জানিনা।

কত কাণ্ডই-না করেছে ঐ নিবারণটা। পুলিশের হাতে পড়েছিলো একবার। বাবা না থাকলে যেতে হোতো হাজতে। রাকা মাঝে মাঝে গান শিখতে আসতো আমাদের বাসায়। সেদিন আসেনি। আমি বসে বসে বাবার সাথে গল্প করছি। এমন সময়ে হঠাৎ তু'টি পুলিশ এসে হাজির। রীতিমতন ভয় পেয়ে গেলাম আমি : হঠাৎ পুলিশ কেন? বাবাকে নাকি থানায় যেতে হবে। কেন ?

: "সনাক্ত করতে।"

: "কাকে সনাক্ত করবো আবার?"

: "একটা লোক আপনার' বাসার কাছেই অন্ধকারে লুকিয়েছিলো। আমাদের লোক তা'কে গ্রেপ্তার করেছে। সে উল্টোপাল্টা কথাবার্তা বলছিলো। এখন বলছে যে আপনি নাকি তা'কে চেনেন, সে নাকি আপনার ছাত্র।"

বাবা গেলেন থানায়। ফিরে এলেন খানিকক্ষণ পরেই। আসামীকে খালাস ক'রে একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন। সে আর কেউ নয়, সেই শয়তান নিবারণ।

কলেজে-পড়া বুড়ো ছেলে ভেঁউ ভেঁউ ক'রে কাঁদছে। কেন যে সে অন্ধকারে লুকিয়েছিলো তা' কিছুতেই বলে না। শুধু এইটুকুই বলে যে কার নাকি এই পথ দিয়েই আসবার কথা ছিল, তাই তার প্রতীক্ষায় নিবারণ আত্মগোপন ক'রে অপেক্ষা করছিলো।

বুঝলাম সে কে?

স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার!

কিন্তু সবাই তো নিবারণ নয়, তবে কেন বিমলদা কলেজ ছেড়ে চলে গেলেন! কেন তিনি এত অস্থির? কেন এক কাজ ছেড়ে আরেক কাজের দিকে তার মন ছুটছে? বয়স তো অনেক হোলো! একটা ছাত্রের ক্ষণিকের ইতরতাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না? কোনোদিনই স্পষ্ট ক'রে চিনতে পারলেমনা বিমলদাকে।

নিজেকেই-বা চিনেছি কতটুকু? পরাশর মিত্তিরের সান্নিধ্য যদি আমার জীবনে না ঘটতো, তবে কি নিজেকে কখনও চিনতে পারতাম এতটুকু? বিমলদার শূন্য স্থান পূর্ণ করবার জন্য এলেন পরাশর মিত্র। প্রথম যেদিন ইংরেজীর এই নূতন অধ্যাপক ক্লাশ নিলেন সেদিন গভীর বেদনা বহন ক'রে ক্লাশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ছিলো বিমলদার ক্লাশের কথা: মনে পড়ছিলো সেই

সুচারু বাচনভঙ্গী : The desire of the moth for the star, of the night for the morrow : সেই বিরাট হৃদয়ের, বিপুল ব্যক্তিত্বের অভাবপূরণের ব্রত নিয়ে আজ এসে উপস্থিত হয়েছে এক বালক, অতি-তরুণ এক অধ্যাপক। সে কি ক'রে পারবে পড়াতে? অসম্ভব। ইংরাজীর ক্লাশের যত আশা, যত আনন্দ,—সব পরিণত হবে পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার বেদনায়। কান্না নেমে এলো প্রথম বর্ষার বিপুল সমাগমের মতন : নিভৃতপ্রাণ বিমলদাকে ডেকে ডেকে বললো—ফিরে এসো, ফিরে এসো, ফিরে এসো!

কিন্তু একী হোলো? সব রঙ্ কি মুছে গেল? সব ছাত্র-ছাত্রীই যে দেখি আশায়-আনন্দে রোমাঞ্চিত! বিমলদার অমন ভাল পড়ানোর কথা এরা কি ভুলে যাচ্ছে? পরাশর বাবু কি এমন পড়াচ্ছেন যা'তে এরা বিমলদার কথা বলছেনা একবারও! তাঁর বিদায়কালের সেই পূরবীর সব রঙ্ কি মুছে যাবে এঁর প্রভাতকালীন বিভাসের প্রসন্ন আভাসে? কি এমন শক্তিশালী গায়ক?

একেবারেই ভাল নয়। কেন যে সবাই ভাল বলছে, বুঝিনা। ঐ ছোকরা কখনও ভাল পড়াতে পারে? বিমলদার চেয়ে ভাল? অসম্ভব। অকৃতজ্ঞ এখানকার সব ছাত্র-ছাত্রী : তাই এরা দু'দিনেই ভুলে গেল বিমলদার কথা। এই যে আমাদের ভারতী, কত-না কেঁদেছিলো বিমলদা চ'লে যাচ্ছেন

শুনে ঃ আর, আজ সে পরাশর মিত্তিরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ! দু'দিনেই তিনি নতুন-অধ্যাপকের প্রিয় ছাত্রী হয়েছেন! অকৃতজ্ঞ কোথাকার!

রীতিমতন একপশলা ঝগড়া হ'য়ে গেল ভারতীর সাথে। ও' জোর ক'রে প্রমাণ করবে যে পরাশর বাবুই ভাল পড়ান। প্রেমে পড়লো নাকি মেয়েটা! কিন্তু একা ওরই-বা দোষ কি? সব মেয়েরাই তো দেখি ওর কথাতেই সায় দেয়! বোবা-কান্নায় ভ'রে গেল আমার সমস্ত মন। অকূল সাগরে পড়লাম। ইংরেজী পড়া বুঝছিনা ঃ সামনে আবার বার্ষিক পরীক্ষার বিভীষিকা! পরাশর মিত্তিরের ক্লাশে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করতেই হবে। কিন্তু কি ক'রে মনোযোগ দেবো। ক্লাশে ঢুকতেই মন চ'লে যায় অতীত দিনে ঃ শুনতে পাই প্রাণের মধ্যে সেই পুরানো দিনের আওয়াজ ঃ সেই অতি গম্ভীর, অনতিমৃদু নরম নরম কথা—

Deep with first love, and wild with all regret;
O Death in life, the days that are no more.

পরাশর মিত্তিরের কোনো কথাই কানে আসেনা, কানে আসে শুধু সেই the days that are no more ঃ আচ্ছন্নের মতন বসে থাকি, আচ্ছন্নের মতন চ'লে আসি ঃ শুনি অন্য মেয়েরা বলছে—মিত্তির নাকি সেদিন অন্যদিনের চেয়েও ভাল পড়িয়েছে।

বার্ষিক পরীক্ষা এলো এবং চলে গেল। ইংরাজীতে শোচনীয় ফল হোল আমার। পাশ হ'তে পারলাম না। চিরদিনের ভাল মেয়ে আমি, ফেল কখনও করিনি। মিত্তির নম্বর দেয়নি আমাকে ঃ হয়তো শুনেছে যে আমি তার প্রশংসা করিনা। ছোক্‌রা অধ্যাপক হ'লে বুঝি এই রকমই হয়। বাইরে অতি-গাম্ভীর্য্যের ভান করে, আসলে, যেমন দেখতে ছোক্‌রা, তেমনি মনেও ছোক্‌রা। ক্ষতি নেই কিছু, অন্য সব বিষয়ে ভাল ভাল নম্বর পেয়েছি, ক্লাশে আট্‌কে থাকলামনা আমি।

হঠাৎ একদিন ডেকে পাঠালেন পরাশর মিত্র। ভাবনা এলো মনে। কি জানি কেন ডাকছে? অনেক খারাপ খাবাপ কথা তো বলি তার নামে। হয়তো সব শুনেছে ঃ হয়তো তারি জন্য বকুনি দেবে' যা' গম্ভীর লোক ঃ একে বয়স কম, তার উপরে গম্ভীর। হয়তো বাবার কাছে ব'লে দেবে! নানান্ ভাবনা ভাবতে ভাবতে গেলাম প্রফেসারদের ঘরে।

অন্য কোন অধ্যাপক নেই। একা পরাশর মিত্তির বসে বসে চা খাচ্ছে আর সিগারেট টানছে। সামনে খোলা আছে একটি খাতা। অনেকগুলি মোটা মোটা ইংরেজী কবিতার-বই টেবিলের উপরে ছড়ানো। আমি ঘরে ঢুকতেই বল্‌লেন—

ঃ "এসো, তোমার নাম হেনা গুহ ?"

মাথা নেড়ে সমর্থন জানালাম। তাকিয়ে দেখি আমারই ইংরেজী পরীক্ষার খাতাখানি সামনে খোলা আছে। ভয় এলো আমার মনে।

ঃ "তুমি কি অনেকদিন পরে কলেজে আসছো ?"

ঃ "না, আমি তো রোজই আসি।"

ঃ "সেকি ? তোমার পরীক্ষার খাতা দেখে তো তা' মনে হয়না !"

ঘাবড়ে গেলাম খুব। ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে পারছিনা। আবার কথা বলতে সুরু করলেন পরাশর মিত্র—

ঃ "আমি এখানে আসবার পর থেকে তোমাদের যতগুলি কবিতা পড়ানো হয়েছে তার একটিও তুমি ঠিকমতন লিখতে পারনি ; অথচ, তুমি বেশ সুন্দর ইংরাজী লিখতে পার, দেখছি।"

ঃ "সবই কি ভুল লিখেছি স্যার ?"

ঃ "ভাষায় ভুল নেই বিশেষ, তবে বিষয়ে খুব ভুল।"

খাতাখানি টেনে নিলেন অধ্যাপক মিত্র। পাতা উল্টাতে থাকলেন, আর বল্‌তে থাকলেন—

ঃ "এই দেখ, তুমি লিখেছ যে শেলী বাল্যাবধি অন্ধ ছিলেনঃ আবার আরেক জায়গায় লিখেছো যে মিল্‌টনের Ode to the west wind কবিতায়—"

ধরণী দ্বিধা হও; আমি আমার লজ্জা রাখি কোথায়? এত বিশ্রী, এমনতরো সব উল্টোপাল্টা কথা লিখেছি আমি? এ-যে আমারই নিজের হাতের লেখা। অনুতাপে মরে যাই: বৃথা এতদিন পরাশরবাবুকে গাল দিয়েছি মনে মনে। তিনি নম্বর দেবেন কি ক'রে? আমি যে সবই ভুল লিখেছি!

: "কাল থেকে যখন ক্লাশ থাকবেনা, তখন বই নিয়ে আমার কাছে এসো।"

জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কেন আসতে বলছেন, বুঝিনা। এত-যে খারাপ বলেছি, একটুও কি রাগ হয়নি ভদ্রলোকের?

: "তুমি যে-সব কবিতা বুঝতে পারনি, আমি বুঝিয়ে দেবো।"

এত ভাল লোক! এত উপকার আমার করবেন? ভয় করে আমার, যদি বুঝতে না-পারি? যদি প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে না-পারি! শুনেছি, পরাশরবাবু অল্পে রেগে যান। আমার উপরে তো তবে খুবই রেগে যাবেন!

পরের সোমবার দিন। তখন আমার ক্লাশ ছিলনা। গেলাম চ'লে পরাশর বাবুর কাছে। ঠিক তেমনিভাবে একা বসেছিলেন প্রফেসারদের ঘরটিতে। তেমনি সিগারেট ধরা আছে তর্জ্জনী আর মধ্যমার মাঝে, তেমনি চায়ের কাপ থেকে ধুঁয়ো উঠছে; অন্যমনস্ক হ'য়ে বসে আছেন

তরুণ অধ্যাপকটি। ধীরে ধীরে গিয়ে সামনে দাঁড়ালাম। চম্‌কে তাকালেন আমার দিকে। মৃদু হেসে বল্‌লেন—

ঃ "এসো হেনা, তোমার জন্যই ব'সে আছি।"

শুধু আমারই জন্য বসে আছেন! আমি যদি না-আসতাম তবে কি সমস্ত দুপুর ব'সে থাকতেন প্রতীক্ষায়? আমি তো প্রায় আসবোনা ব'লেই সিদ্ধান্ত করেছিলাম। ভেবেছিলাম, কথার কথা বলেছেন মাত্র, তাঁর কি দায় পড়েছে আমাকেই বিশেষ ক'রে পড়ানোর জন্য! আমি তো তাঁর বিরুদ্ধবাদিনী। তবু কী আশ্চর্য্য, আমারই জন্য ব'সে আছেন ঃ অনুতাপ রাখি কোথায়!

বই খুল্‌লেন পরাশর মিত্তির। পুরানো একটি কবিতা বে'র করলেন। শেলীর কবিতা—Ode to the westwind —সুরু হোলো অর্থব্যাখ্যা, ভাব ব্যাখ্যা।

ঝড় এলো। প্রবল-প্রচণ্ড ঝড় এসে পড়লো অন্তরে-বাহিরে। শুধু ঝড় নয়—Wild spirit ঃ Destroyer and Preserver—পশ্চিমাবায়ুর প্রবলশক্তি ছুটে এসে ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত প্রকৃতির গায়ে। পশ্চিমাবায়ুর অন্তরের গভীরে প্রবেশ করেছেন শেলী, তাকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে নববেশে সাজিয়েছেন। ঝড় এসে পাতা ঝরায়, গাছের সবপাতা,—বিবর্ণ, বিশীর্ণ শুক্‌নো পাতার বুক কেঁপে উঠলো

ঝড়ের ধাক্কায়। আকাশে-আকাশে বর্ষণভারাক্রান্ত মেঘের বুকে বুকে বিদ্যুৎ জেগে উঠলো। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির অণুতে পরমাণুতে এলো গভীর আলোড়ন। পুরাতন কেঁপে উঠলো, ঝরে পড়লো,—মহানূতনের জন্ম সমাগত। ভূমধ্যসাগরের অতল-গভীরে যে সুগভীর স্বপ্ন গড়ে উঠেছিলো অনেক সাধ, অনেক আহ্লাদ নিয়ে, চূর্ণ হোলো তা'। ঘুমভাঙ্গা কুম্ভকর্ণ জেগে উঠলো। পুরাতন স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়ে নূতন উদ্দীপনায় প্রবল প্রতাপে জাগলো ভূমধ্য সাগর। প্রবল উত্তেজনায় চিৎকার ক'রে উঠেছেন শেলী—make me the lyre—আমাকে তোলো, আমাকে জাগাও, হে নূতন, দেখা দিক আরবার আমার নূতন রূপ। সব পুরাতন দূরে যাক, মরে যাক।

মরে গেল, ঝরে গেল। পুরাতনের সব রঙ্ মুছে গেল বুঝি!

কলেজ ছুটি হ'য়ে গেছে। মেয়েরা সবাই বাসায় চলেছে। পরাশরবাবুর কাছে পড়তে গিয়ে এত মগ্ন হ'য়ে গিয়েছিলাম যে কখন ঘণ্টা পড়ে গেছে, বুঝতে পারিনি। বাংলার ক্লাশ ছিল, সে ক্লাশে থাকা হোলোনা। না-ইবা হোলো, তা'তে ক্ষতি নেই: প্রভাতবাবুর ক্লাশে থাকাও যা', না থাকাও তাই।

: "কি রে হেনা, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?"

বাসায় ফিরছে ভারতী। চম্‌কে উঠলাম তার প্রশ্নে। একটু ইতস্ততঃ ক'রে উত্তর দিলাম—

ঃ "পড়ছিলাম।"

ঃ "পড়ছিলি? কোথায় পড়ছিলি? কি পড়ছিলি?"

ঃ "পরাশরবাবুর কাছে ইংরাজী পড়ছিলাম।"

ঃ "সে কি রে? এত না খারাপ পড়ায় পরাশর মিত্তির! তবে যে হঠাৎ তাঁর কাছে পড়তে গেলি?"

ঃ "যত খারাপ ভেবেছিলাম, তত খারাপ পড়ান না।"

ঃ "তবে বুঝি অল্প খারাপ পড়ান!"

ঃ "না, বেশ ভালই পড়ান—চমৎকার পড়ান।"

ঃ "তাই নাকি?"

কৌতুক ছড়িয়ে পড়ছে ভারতীর চোখে মুখে। কালো হ'য়ে উঠছি আমি। বিঁধছে, সমস্ত গায়ে বিঁধছে আমার। শেষপর্য্যন্ত ভারতীর কাছে হেরে গেলাম?

হেরেই চলেছি। ভারতীর কাছে হেরেছি, দীপার কাছে হেরেছি, ছোটমাসির কাছে হেরেছি, আর হেরেছি বিমলদার কাছে। এই যে আমার বাসরঘর, এ-ও আমার হারেরই চিহ্ন। আরেকজনের কাছে হার মানবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি মনে মনে। অবনীশের কাছেও হার মানতে হবে।

হারিয়ে দিয়েছি একজনকে, তার নাম পরাশর মিত্র।

প্রায় প্রতিদিনই যেতাম পরাশরবাবুর কাছে পড়তে। প্রাণ দিয়ে পড়াতেন ভদ্রলোক। পড়িয়ে আবার প্রশ্ন দিতেন উত্তর লিখে আনবার জন্য। পরের দিন উত্তর লিখে নিয়ে যেতাম। যেদিন লিখতাম না সেদিন সাংঘাতিক রেগে যেতেন। আর পড়াবেন না ব'লে জবাব দিয়ে দিতেন। ডেকে পাঠাতেন ঠিক পরের দিনই। প্রাণ খুলে গাল দিতেন, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতাম আমি—জানতাম সে রাগ বেশীক্ষণের জন্য নয়। খানিকক্ষণ পরেই বলতেন—"বোসো।" আরম্ভ করতেন নূতন কবিতা।

বর্ষণমুখর রাতে নিবু নিবু প্রদীপের আলোয় ঘরের কোনে বসে থাকা শিশুর মনে আকাশের বিদ্যুতের হঠাৎ-আলোর ঝলকানি যেমন একই সাথে সৃষ্টি করে আতঙ্ক ও আগ্রহের, আমারও মনে তেমনি পরাশর মিত্তিরের কার্য্যক্রম আলোছায়ার, —আতঙ্ক ও আগ্রহের সৃষ্টি করলো। কখনও আহ্লাদিত হই, কখনও ভয় পেয়ে যাই। কখনও গভীর স্নেহে ডাক দেন, প্রাণ ঢেলে পড়ান,—আবার কখনও গম্ভীর হ'য়ে যান, বাক্-সংযম করেন,—একেবারেই আমল দেন না। শ্রদ্ধা আসে, ভক্তি জাগে, আবার ভয়ও হয়।

ভয় ভেঙ্গে গেল একদিন।

ঠিক সময়ের আগেই কলেজ ছুটি হ'য়ে গেছে। অন্য মেয়েদের সাথে আমিও বাসায় আসবার জন্য বেরিয়েছি।

করিডোর পার হ'য়ে চলেছি দলবেঁধে। পেছন থেকে অধ্যাপক মিত্রের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—"হেনা!"

ফিরলাম। সব মেয়েরা দাঁড়িয়ে গেল। পরাশরবাবু এগিয়ে এলেন। প্রশ্ন করলেন—

ঃ "তুমি চ'লে যাচ্ছ?"

ঃ "হ্যাঁ।"

ঃ "তাড়া আছে কিছু?"

ঃ "না।"

ঃ "একটু অপেক্ষা করো। আমার একটু দরকার আছে।"

অন্য মেয়েদের বিদায় দিলাম। ফিরে এলাম আমাদের বসবার ঘরে। পরাশরবাবু কোথায় গেলেন, কেন ডাকলেন, কি দরকার—কিছুই বুঝলাম না। উশখুশ করতে থাকলাম। ভয় এলো, ভাবনা এলো। কি-বা ভুল লিখেছি বোধ হয় খাতায়, হয়তো তার জন্য বকুনি দেবেন। নানান্ চিন্তায় যখন প্রায় দিশেহারা হ'য়ে পড়েছি, তখন পরাশরবাবু এলেন। বাইরে থেকে ডাকলেন—"শোনো।"

বাইরে এলাম। লম্বা বারান্দার এক প্রান্তে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম। হঠাৎ ব'লে বসলেন—

ঃ "তোমার কানে কি লেগে আছে?"

ঃ "কানে?"

ঃ "হ্যাঁ। বোধ হয় প্রসাধনের চিহ্ন।"

লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে হোলো আমার। দ্রুত হাতের পেষণে বোধকরি লাল হয়ে উঠলো আমার সুগৌর কর্ণমূল ! মুখ টিপে টিপে হাসছেন অধ্যাপক পরাশর মিত্র।

ঃ "না, উঠলোনা। ওখানে নয়,—এইখানে।"

স্পর্শ। পরাশর মিত্তিরের স্পর্শ আমার কর্ণমূলে। কুঁকড়ে গেলাম আমি ঃ পায়ের নীচে পৃথিবী দুলতে লাগলো। ছুটে চলে আসতে চাইলাম, পারলাম না।

ঃ "আমাদের বাসায় একবার যেতে পার ?"

একমুহূর্ত্তও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না আমি। একি হোলো ? প্রথম পুরুষ-পরশ-মুগ্ধা,—একী আকুলতা ভুবনে, একী চঞ্চলতা পবনে ! প্রাণপণ শক্তিতে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে এলাম।

চলে এলাম বন্ধ ঘরের কোনে। কেউ নেই সে ঘরে। আমার পড়ার ঘর। জানালার পাশে গিয়ে বসলাম। গান, —গান জাগছে প্রাণে, 'দোলে মন দোলে অকারণ হরষে।' গভীর উষ্ণতা আমার কর্ণমূলে, কোথা থেকে এলো এ উত্তাপ ! এই উত্তাপে সব জড়তা গলে বুঝি তরল হয়ে যাবে ? কে দিলো এই উত্তপ্ত পরশ ?

পরাশর। মৎস্যগন্ধার গায়ে পরাশরের স্পর্শ ঃ সত্যবতীর জীবন বুঝি পূর্ণ হোলো, ধন্য হোলো ঃ তার দেহের মৎস্যগন্ধ পদ্মগন্ধে পরিণত হোলো বুঝি ! পাপের গন্ধ আমার সারা

অঙ্গে ; প্রেমের সাথে প্রতারণা করেছি : ছোটমাসি-বিমলদার প্রেমের স্বপ্নকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি : ধুয়ে দাও, মুছে দাও, আমার সে পাপ দূর ক'রে দাও !

ডেকেছেন।

যাব। না, যাবনা।

কিন্তু না-গেলে কি ভাববেন ?

কি ক'রে যাই ?

ইচ্ছে করলেই তো যাওয়া যায়না : লোকে কি ভাববে ?

একজন তরুণ অধ্যাপকের বাসায় যাচ্ছি আমি: সেই অধ্যাপকের বাসায়, যে আমার—

না। ছিঃ। যাবনা।

কিন্তু আমি যে সম্মতি জানিয়ে এসেছি !

তা' হোক।

যেতাম। নিশ্চয় যেতাম।

কৃতী অধ্যাপকের গুণমুগ্ধা ছাত্রী নিশ্চয়ই যেতে পারে। কিন্তু—

কিন্তু, কেন তিনি এ-কাণ্ড করলেন ?

যাবনা। কক্ষনো যাবনা।

আর একবার না ডাকলে যাব না

সেই কলেজ। পরের দিন এসে দাঁড়ালাম আবার সেই কলেজে। সেইখানটায় এসে একবার থমকে দাঁড়ালাম,—যেখানে অতবড় কাণ্ড ঘটেছিলো। আবার সেই লজ্জা এলো। কিন্তু স্বাভাবিক আমাকে হ'তেই হবে, নইলে ভারতীব দৃষ্টি এড়াতে পারবোনা। ভারতী টের পেলে আর রক্ষে থাকবেনা। কিন্তু কতক্ষণ ভুলে থাকবো? ইংরাজীর ক্লাশ! তখন তো আবার দেখা হবে পরাশর মিত্তিরের সাথে: মনে পড়ে যাবে সব কথা!

দেখা হোলো। একবারও তাকালেন না আমার দিকে। হয়তো তাকিয়েছিলেন, আমি দেখতে পাইনি। আমিও তো তাকাতে পারিনি একবারও। কেন পারিনা? কিছুই তো পারলামনা। মনেব সাথে যুদ্ধ ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লাম, কিছুই তো করতে পারলামনা। দিনের পর দিন চলে গেল—একটি, দু'টি, তিনটি—অনেকগুলি দিন। পরাশরবাবুর বাসায় যাওয়া হোলোনা।

কি ভাববেন? ভয় হোলো, ভাবনা এলো।

সেদিন ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়ালাম প্রফেসারদের বসবার ঘরে। আরও দু'জন অধ্যাপক বসে আছেন। একজন বসে বসে ঘুমুচ্ছেন, আর একজন গভীর মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছেন। পরাশর মিত্তির তেমনি গম্ভীর হ'য়ে বসে সিগারেট টানছেন। আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর

কাছে। মুখ তুললেন না, চিনতেই যেন পারলেন না। গম্ভীর, অতি-গম্ভীর।

ঃ "স্যার!"

মুখ তুললেন পরাশরবাবু। নির্ব্বিকার উদাসদৃষ্টি মেলে ধরলেন আমার মুখের উপর। চোখ নামিয়ে নিলেন আবার।

ঃ "আপনি যেতে বলেছিলেন। আমি যেতে পারিনি।"

ঃ "বেশ করেছো।"

অভিমানে উত্তাল হ'য়ে আছে কণ্ঠস্বর। মন আমার কেঁপে কেঁপে উঠছে ভয়ে। এত ভাল অধ্যাপক, এমন স্নেহ করেন আমাকেঃ এত ক'রে যেতে বল্‌লেন, আর আমি গেলামনাঃ ছিঃ, অন্যায় করেছি আমি। এ-অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করি কি ক'রে?

ঃ "আর একদিন যাব স্যার।"

ঃ "সে তোমার ইচ্ছা।"

রীতিমতন রেগে গেছেন। উত্তর শুনলেই বোঝা যায়। কি ক'রে বলি কেন আমি যেতে পারিনিঃ কিসের লজ্জা আমাকে পেয়ে বসেছিলো। হয়তো আমার মনের ভুল। হয়তো যা' ভেবেছি তা' ঠিক নয়। আমার মনেরই দোষ।

যাবই, আমি যাবই। যেতে আমাকে হবেই। আমার মনের গ্লানি দিয়ে পরাশর মিত্তিরের অমর্য্যাদা কর্‌তে আমি

পারবোনা। কিন্তু একী হোলো! এত ভেবেও যে যেতে পারিনা। আবার কোথা থেকে সঙ্কোচ আমাকে ঘিরে ধরে! যাবার কথা ভাবলেই কানটা আমার গরম হ'য়ে ওঠে কেন?

হোলোনা, যাওয়া হোলোনা। দ্বিধায়-দ্বন্দ্বে কেটে গেল অনেকগুলি দিন।

গান গেয়ে এলাম রেডিওতে: "যাবই, আমি যাবই, বাণিজ্যেতে যাবই।" গান শেষে বাসায় ফিরছি। সন্ধ্যার আবছায়া নেমেছে লালদীঘির বুকে: মন্থর হ'য়ে এসেছে কর্ম্মক্লান্ত মানুষেরা। ট্রাম থামছে, চল্ছে, খটাং খটাং শব্দ করছে ট্রামচালক। লেডিস্ সিট্ এ ব'সে আকাশ-পাতাল ভাবছি আমি। ট্রামে খুব ভিড়: তিলধারণের স্থান নেই: সেই ভিড়ে একটি আসন জুড়ে আমি একা বসে আছি। অফিস-ফেরতা মানুষগুলি ঝুলছে বাদুড়ের মতন; আমি দিব্যি আরামে বসে আছি। লজ্জা করছে আমার। একজনকেও তো পাশে বসতে দিতে পারি? কিন্তু পারছিনা কেন? লজ্জা। চিন্তা ছিঁড়ে গেল: ঘটাং ক'রে আচম্কা থামলো ট্রামটা। লাটপ্রাসাদের সামনে লাল আলো জ্বলে উঠেছে: যানবাহনের থামবার সঙ্কেত। সবুজ আলো জ্বল্লো আবার। হ্যাঁচ্কা টান দিয়ে ট্রাম চল্তে সুরু করলো,— সেই টানে ছিট্কে পড়লো একখানা মোটা বই আমারই পায়ের কাছে। পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা কোনও ভদ্রলোকের

হাত থেকে ছিট্‌কে পড়েছে। তাড়াতাড়ি বইখানা তুলে তাঁর হাতে দিতে গেলাম—

একি? পরাশরবাবু। তাঁরই হাতের বই। ছিঃ ছিঃ, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন! সসম্মানে উঠে দাঁড়ালাম আসন ছেড়ে।

: "একি, তুমি উঠলে কেন? বোসো।"

: "আপনি বসুন।"

ছু'জনেই বসলাম।

: "কোথায় গিয়েছিলে?"

: "রেডিওতে।"

: "গান ছিল বুঝি?"

ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানালাম। আবার চুপ। উশখুশ করছিলাম মনে মনে।

: "আপনি আমাকে যেতে বলেছিলেন।"

: "সে তো অনেককালের কথা! মনে আছে তোমার?"

লজ্জা পেলাম। কি ক'রে জানাই আমার সব কথা!

: "আমি যেতে পারিনি।"

: "সে তো জানি।"

সেই অভিমান। এখনও আছে। আজ আমি বে-পরোয়া। এমন সুযোগ আর আসবেনা। 'জীবনে পরমলগন কোরোনা হেলা।'

ঃ "কেন ডেকেছিলেন ?"

ঃ "তা' শুনবার আগ্রহ তোমার আছে ?"

ঃ "বলুন।"

ঃ "সে-যে অনেক কথা।"

ঃ "অনেক কথাই বলুন।"

ইতঃস্ততঃ করলেন পরাশরমিত্র। মিউজিয়ামের উল্টোদিকে ট্রাম দাঁড়িয়েছিলো। চল্‌তে স্রুরু করবে। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন পরাশরবাবু ঃ দড়ি ধরে টান মারলেন ঃ টুং কোরে ঘণ্টা বেজে উঠলো ঃ থেমে গেল ট্রাম। আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—'নামো'। দ্বিধা-লজ্জা-চিন্তার অবসর পেলামনা একটুও। নেমে পড়লাম। টুংটুং ক'রে আবার ঘণ্টা পড়লো, ট্রাম চলে গেল। মুখোমুখি ঃ আমি আর পরাশরমিত্র।

অন্ধকারে কালো হ'য়ে গেছে পৃথিবী। সমস্ত ময়দানটা নিশুতিকালো ঃ কালো হ'য়ে গেছি আমি। ট্রামলাইন ছেড়ে ময়দানে এসে পড়েছি, পাশাপাশি আমি আর পরাশরমিত্র। দেখবে হয়তো কেউ ঃ সমস্ত কোলকাতা বুঝি দেখছে আমাদেরকে! সন্ধ্যার অন্ধকারে ইংরাজী সাহিত্যের তরুণ অধ্যাপকের পাশে চতুর্থবার্ষিকের ছাত্রী আমি ঃ নিরালা ময়দান। যদি কেউ দেখে, কি বল্‌বে ? না-দেখতেই তো বল্‌তে ছাড়েনা পিশাচেরা। সন্ধ্যাদির নামে কিনা বলে-ছিলো ? আমার নামে বলা-তো অনেক সহজ! অনন

মেয়ে যে সন্ধ্যাদি, তারও নামে চিঠি ছাপিয়ে ফেলেছিলো অকারণেঃ মিথ্যা দুর্ণাম দিয়েছিলো সবাই মিলে।

সন্ধ্যাদিদের কলেজে নূতন অধ্যাপক এসেছিলেন সোমেন বাড়ুয্যে ঃ দর্শনের সুদর্শন অধ্যাপক। দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়েছিলেন সন্ধ্যাদি। ভালমেয়ে; তাঁর নিজেরও অহঙ্কার ছিল ভাল মেয়ে ব'লে। ছেলেদের আমল দিতেন নাঃ সোমেনবাবুও নাকি আমল দিতেন না কাউকে। দু'জনেরই উপর রাগ ছিল ছেলেদের। তারপরে একদিন সেই লজ্জাকর কাহিনীর অবতারণা। সকলেরই বাড়িতে ডাকযোগে নিমন্ত্রণ-পত্র এলো ঃ ছাপানো নিমন্ত্রণপত্র সোমেনবাবুর বাবার নাম দিয়ে ঃ এক বিশেষ তারিখে নাকি সোমেনবাবুর সাথে সন্ধ্যাদির বিয়ে হবে! সন্ধ্যাদির নামেও এসেছিলো একখানা। নির্ব্বাক হ'য়ে গেলেন চিঠি পেয়ে। কে-যে ছাপালো অমন চিঠি তা' জানা যায়নি কোনোদিনই।

বয়স হ'য়ে গেছে অনেক সন্ধ্যাদির। আনন-ভরা বয়সের ছাপ আজ আর প্রচুর প্রসাধনেও ঢাকা পড়েনা। বছরের পর বছর ধ'রে দর্শনের নূতনতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য গবেষণা ক'রে চলেছেন। বাপ-মা হার মেনেছেন, বিয়ে করতে রাজী করাতে পারেননি। পরিচিত মহলে বিবাহরাত্রে কণে' সাজানোর ভার পড়ে সন্ধ্যাদির উপরে। গভীর অভিনিবেশ আসে তাঁর এমনতরো কাজে। যে সুন্দর সৌষ্ঠবমণ্ডিত

মুখখানি দেখে বিয়ের রাতে নতুন বর হয় আবেশ-বিভোর, সে মুখের অনেকখানি লালিত্য যে বাড়িয়ে তুলেছেন সন্ধ্যাদি, সে সংবাদ থেকে যায় সবার অগোচরে। সবার বিয়েতেই তাঁর আগ্রহ দেখা যায়, শুধু নিজের বিয়ের কথাতেই যত ঔদাসীন্য।

সন্ধ্যাদির কোনোদিকেই ভরসা ছিলনা, সোমেনবাবু ছিলেন নির্বিকার। কিন্তু আমার তো ছিল। দীর্ঘ দুই ঘণ্টার নানাকথার মধ্যদিয়ে সেদিন পরাশরমিত্র একটি কথাই আমার মন থেকে টেনে বে'র কর্‌তে চেষ্টা করেছেন: আমার সম্মতি। পারিনি, কোনও উত্তরই দিতে পারিনি। আমার জীবনটাকে পরাশরবাবুর জীবনের সাথে জুড়ে দেওয়া যায় কিনা তার উত্তর দিতে আমি পারিনি। আমার কণ্ঠে বুঝি স্বর ছিলনা! কথা হোলো, লিখে জানাবো। দুরু দুরু বুকে সেদিন বাসায় ফিরে এলাম। লিখে জানাতে হবে পরাশর বাবুকে, তা' সে সম্মতিই হোক, আর অসম্মতিই হোক্!

অসম্মতি তখন কেমন কোরে হবে! আমার যে সম্মতি অনেক আগে থেকেই হ'য়ে আছে! সেই কর্ণমূলে স্পর্শ: সে-যে ভুলতে পারিনি। প্রথম দিক্‌কার বিরাগ কবে-যে অনুরাগে পরিণত হয়েছে তা'কি বুঝতে পেরেছি? কিন্তু, সবাই কি ভাববে? বাবা কি ভাববেন? মা: ছোটমাসি:

বুড়িঃ আর-আর সবাই? ভারতী কি ভাববে? কত ঝগড়া করেছি ভারতীর সাথেঃ কত খারাপ বলেছি এই পরাশরকে! ক্ষমা করিস ভারতী, তোর মনে অনেক ব্যথা দিয়েছি। কিন্তু, তুইও কি ভালবেসেছিলি তোর এই অধ্যাপকটিকে? সে-তো তোকে স্নেহ করে, ভালবাসে আমাকে।

হ্যাঁ, ভালবাসাই বল্‌বো। অনেক ভালবেসেছিলেন, আগে বুঝিনি ঃ পরে বুঝেছি। যখন বুঝেছি তখন গান গেয়ে উঠেছি মনে মনে, 'এ জীবন পুণ্য কর'। এত ক'রে যে চেয়েছি তা'কে, সেকি সত্যিই চাওয়া! জীবনভোর সকলের কাছে হার মেনে মেনে পরাজয়ের বিষে নীল হ'য়ে গেছি আমি, কিন্তু একটি জায়গায় আমি অ-নীল।

হারিয়ে দিয়েছি একজনকে, তার নাম পরাশরমিত্র।

স্বপ্ন দেখেছি। দিনের পর দিন স্বপ্নের জাল বুনেছি বসে বসে। চিঠিঃ চিঠি ভেবেছি মনে মনে। সম্মতি জানাতে হবে পরাশরকে ঃ চিঠিতে সম্মতি। আমার অঙ্গে অঙ্গে তার জয়গান বাজছে, আমার সঙ্গে সঙ্গে তার ছায়া ভাসছে। তা'কে আমার চাই। কি ক'রে জানাবো তাকে আমার এই চাওয়ার কথা। ভয় পাইঃ কেন ভয় আসে? চিঠি লিখতেও ভয় আসে কেন? তবু তো তা'কে চিঠি লিখতেই হবে আমার।

চিঠি—

"কেন পারিনা জানো? আমি জানিনা। শুধু জানি, আমি বল্‌তে পারিনা। যে কথা বল্‌বার জন্য সমস্ত চিত্ত আমার উৎকণ্ঠিত হ'য়ে আছে সে-কথা বল্‌তে গিয়েও বল্‌তে পারিনা। তুমি তো অনেক বোঝো, এ-টুকু বোঝোনা যে আমি তোমাকে কত ভালবাসি? আমি যে তোমাকে অনেক আগে থেকে ভালবেসেছি। তোমার প্রাণের সব দুঃখ, সব বেদনাকে আমি প্রাণ দিয়ে মুছে দিতে চাই। তোমার সব শূন্যতাকে আমি পূর্ণ করবো! আমি ভালবাসি, কত ভালবাসি! সেই কবে থেকে ভালবাসি! তুমি জানোনা, তুমি জানোনা, সেই শিশুকাল থেকে আমি তোমাকে ভালবাসি; আমার সব-সত্তাকে তোমার পায়ে বিলিয়ে দিয়েছি-যে! তোমাকে চাই, তোমার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা অনেকদিনের, Moth for the star, night for the morrow: পাব কি? পাব কি? আমার দেহের শিরায় শিরায়, আমার প্রাণের পরতে পরতে তুমি, তুমি, তুমি। তুমি আর কারুর নয়, তুমি আমার। তোমার সব ক্ষতকে আমি নিরাময় করবো, তোমার সব বেদনাকে আমি ভুলিয়ে দেবো। ভিক্ষা চাই, তোমাকে আমি ভিক্ষা চাই। আমি জানিনা কেন তুমি দিশেহারা? কেন তুমি পারনা আমাকে ছিনিয়ে নিতে?, এতজনের মন কেড়ে নাও ক্লাশে, আমাকে কেড়ে নিতে পারনা? আমাকে যে অন্য কেউ নিয়ে যেতে

চায়! আমি সংযুক্তা দাঁড়িয়ে আছি বরমাল্য নিয়ে, তুমি পারনা পৃথ্বিরাজ হ'তে? সেই কতকাল আগে থেকে তোমাকে যে আমি ভালবাসি বিমলদা!"

—একি? ভালবাসি কাকে? বিমলদাকে? পরাশরকে নয়? পরাশরকে নয়?

পরাশরকে নয়।

বিমলদাকে? আমার ছোটমাসির প্রণয়ীকে? একি স্বপ্ন, একি মায়া! সেই বিমলদা? যাকে গুরুজন ব'লে মানি, যাকে ভক্তি করি, যাকে দগ্ধ করেছি কৈশোরের চাপল্যে? সেই বিমলদা, যে আমার চেয়ে অনেক বড়? 'তুমি কোন্‌পথে যে এলে পথিক, আমি দেখিনাই তোমারে!' কেন এমন হোলো? কি হবে আমার? কবে থেকে আমি বিমলদাকে ভালবাসলাম? কেন ভালবাসলাম! কেমন কোরে ভালবাসলাম? বিমলদার গোপন-প্রেমের আমিই যে একমাত্র সাক্ষী; বিমলদার সকল প্রেমকে আমিই যে হত্যা করেছি! ছোটমাসি, পারবে? পারবে তোমার হেনাকে ক্ষমা করতে? জানি, জানি তুমি পারবেনা।

তবু আমি বিমলদাকেই ভালবাসি।

কিন্তু পরাশরবাবুর কি হবে? তিনি যে আমার উত্তরের প্রত্যাশায় আছেন? তাঁকে কি উত্তর দেবো? যদি উত্তর

না দিই ? দেবোনা। চিরদিনের জন্য নির্ব্বাক হ'য়ে যাবো। কোনো প্রশ্নেরই কখনও উত্তর দেবোনা, স্থাণুর মতন হ'য়ে যাবো। হায় অধ্যাপক, তুমি পরাজিত। তোমাকে ভক্তি করি আমি, ভালবাসতে পারলামনা। যাকে ভালবাসি, তাকেই এতদিন ভক্তি করি ব'লে ভুল করেছি। তোমার প্রতিষ্ঠা, তোমার মর্য্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে, ছাত্রীর কাছে পরাজয়ের এই লজ্জার ইতিহাস কোনোদিনই প্রকাশ পাবেনা।

সেই যেদিন থেকে আমার মনের নিভৃত মন্দিরে বিমলদার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত ব'লে জেনেছি, সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত কত কথাই তো মনের মধ্যে মরে আছে, তা'কে কোনোদিনই বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করিনি। আজই প্রথম এই বাসরঘরে এসে সে-সব কথা প্রাণের মধ্যে জেগে উঠছে। বাসররাতের প্রথম প্রহর কেটে গিয়ে দু'জনেরই চোখে ঘুম এসেছিলো। একজন এখনও ঘুমুচ্ছে : চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, নিশ্চয়তার স্বপ্ন তার চোখে; গভীর ঘুমে ডুবে গেছে একেবারে। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, আর ঘুম আসেনি। জেগে আছি, মজে আছি, অতীতের ইতিহাস রোমন্থনে মগ্ন হ'য়ে আছি। যত কথা ছিল মনের মধ্যে লুকিয়ে তারা সব বেরিয়েছে, ছড়িয়েছে, হামাগুড়ি দিচ্ছে এই বাসররাতের বাতাসের বুকে বুকে আমার

মনের নিভৃত কারাগারে তারা সব বন্দী ছিলো, আজ সুযোগ বুঝে মুক্তি নিয়েছে, ছুটে বেরিয়ে গেছে মন থেকে।

আমিও সেদিন এমনি ক'রেই ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। পরাশরকে ভালবাসতে গিয়ে যেদিন জানলাম আমি বিমলদাকে ভালবাসি, সেইদিন। সেদিন সটান গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম বিমলদার পণ্ডিতিয়া রোডের বাসায়।

তাঁর ঘরে পা দিয়েই মনটা আমার কেঁপে উঠলো। কেন এলাম? কি বলতে এলাম? যা' বল্‌তে এলাম তা' কেমন কোরে বল্‌বো? তিনি-যে অনেক বড়! তাঁর সাথে আমার অনেক দূরত্ব-যে! কত ছোট আমি। সেই আমি, কুল খেতে গিয়ে ধরা পড়েছিলাম বিমলদার হাতে, কেঁদেছিলাম তাঁর কোলে মাথা গুঁজেঃ গভীর স্নেহে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন আমাকে। সেই বিমলদা! সেই বিমলদাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। তিনিই আমার প্রিয়, এতদিন ছিলেন দেবতাঃ দেবতাকে কবে আমি প্রিয় ক'রে ফেলেছি!

ঃ "আরে, হেনা যে! এসো, এসো।"

অতি-গম্ভীর গুরুজনের আহ্বান। কত দূর থেকে আহ্বান, বিপুল সমুদ্রের ওপার থেকে আহ্বান! পাথরের দেবতা দূর থেকে অহরহ ডাকছেনঃ তাঁরই উদ্দেশে দূর থেকে ফুল ফেলে দিচ্ছি। কাছে যেতে পারছি কই? হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করা সম্ভব হবে কি ক'রে? দূরে, আজও

তেমনি দূরে রয়ে গেছেন, অন্ধকারের অন্তরালে তেমনি অস্পষ্ট। আমার রাজা, অন্ধকারের রাজা, কোনোদিনই কি আলোয় আসবেন না?

ঃ "কি ভাবছো হেনা? বোসো!"

বসলাম। প্রবীণ-গম্ভীর আমার বিমলদা।

ঃ "অনেকদিন পরে এলে তুমি।"

ঃ "আপনিও তো অনেকদিন যান না।"

ঃ "হ্যাঁ, অনেকদিন যাইনি। নাইট-ডিউটি ক'রে আর যেতে পারিনা।"

শরীর ভেঙ্গে গেছে বিমলদার। রাত্রি-জাগরণের চিহ্ন সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে চোখের কোণে কোণে। আমার আদরের দেবতা, অনাদরের ধূলো মেখেছে সারা অঙ্গে।

ঃ "তুমি অনেক শুকিয়ে গেছো হেনা। অসুখ করেছিলো নাকি?"

ঃ "না।"

ঃ "পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?"

মানুষ নয়, শিক্ষক। ছেলেমেয়েদের যন্ত্র ব'লে ভাবে। শুধু পড়া, আর পড়া। প্রাণ নেই, মন নেই, অনুভূতি নেই। আমি কি শুধুই একজন ছাত্রী? আমার সব পরিচয় আজ প্রকাশ করতে হবে, এমন কোরে নিজেকে লুকিয়ে রাখলে আমার চল্‌বেনা, মনটাকে আজ খুলে ধরতেই হবে।

ঃ "পড়াশুনা আমার হচ্ছেনা বিমলদা।"

ঃ "সেকি? হচ্ছেনা কেন?"

ঃ "ভাল লাগেনা।"

ঃ "পড়াশুনা ভাল লাগেনা? এমন তো ছিলেনা? অবাক্ ক'রে দিচ্ছো-যে!"

ঃ "কিছুই আমার ভাল লাগেনা।"

শুনতেই পেলেন না-যেন! অন্যমনস্ক হ'য়ে রইলেন। বিমলদার মা এলেন খাবার হাতে নিয়ে। কখন টের পেয়েছেন যে আমি এসেছি। বড় ভালবাসেন আমাকে। প্রণাম করলাম। মাথায় হাত দিলেন, বুকে জড়িয়ে ধরলেন। খানিকক্ষণ কথা ব'লে চ'লে গেলেন ভেতরে।

আমি উঠতে পারছিনা। আজ আমাকে বল্‌তেই হবে। তিনি যতদূরেই থাকুন, তাঁকে কাছে টেনে আনবোই।

ঃ "পড়াশুনায় মন দাও হেনা, পরীক্ষা সামনে।"

আবার সেই একই কথা। কত ভাল লাগে?

ঃ "কিছুই-যে ভাল লাগছেনা বিমলদা!"

ঃ "লাগবে, লাগবে,—সবই ভাল লাগবে।"

প্রবীণ-গম্ভীর অভিভাবকের সান্ত্বনা-বাক্য। একটু কৌতূহল নেই, আগ্রহ নেই,—নির্ব্বিকার-উদাস। কিসে ভাল লাগবে? কেমন কোরে ভাল লাগবে? তুমি যদি ভাল না লাগাও, তবে ভাল লাগবে কি ক'রে?

: "আমি তো শুনলাম, তুমি বেশ ভালই পড়াশুনা করছো।"

: "কোথায় শুনলেন ?"

: "তোমাদের ইংরাজীর অধ্যাপক পরাশর মিত্রের সাথে সেদিন দেখা হ'য়েছিলো। তার কাছেই শুনলাম।"

কাঁপছে। আমি কাঁপছি। চেয়ার কাঁপছে, ঘর কাঁপছে, পৃথিবী কেঁপে কেঁপে উঠছে। পরাশরের সাথে বিমলদার দেখা। পরাশরের সাথে বিমলদার আলাপ! আর কি কথা ? আর কি শুনেছেন ? আর কি বলেছে পরাশর ?

: "কেমন লাগছে পরাশর বাবুকে ?"

নীরব। কি বল্‌বো ? যদি বলি ভাল, তবে অন্য কথা ভাববেন। যদি বলি খারাপ, তবে মিথ্যে বলা হবে। কার কাছে মিথ্যে বল্‌বো ? যার কাছে কোনো কথা গোপন রাখা যায়না, তার কাছে মিথ্যে বল্‌তে তো আসিনি। জীবনের চরম সত্য কথাটি বল্‌বার জন্যই তো আজ তাঁর কাছে ছুটে এসেছি।

উত্তর দিলাম না। নীরব।

: "বেশ ভাল ছেলে। আমার তো খুব ভাল লাগে। ওর মুখে তোমার প্রশংসা শুনে আরও ভাল লাগলো।"

কিসের ইঙ্গিত ? কি বল্‌তে চান বিমলদা ? খুলে বলো, খুলে বলো বিমলদা, তুমি কি অন্যকিছু ভেবেছো ?

ভুল, ভুল,—যদি ভেবে থাকো তবে তা' মস্ত বড় ভুল। আমি যে তোমাকেই— ঃ যত কথা ভাবি তত কথা বল্‌তে পারিনা কেন?

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো আমার বুক থেকে।

চম্‌কে উঠলেন বিমলদা। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

ঃ "অনেকদিন তোমার গান শুনিনি হেনা। একটা গান শোনাবে?"

হ্যাঁ, তাই শোনাবো। গান দিয়েই প্রাণের কথা শোনাবো। গানই আমি জানি, আর তো কিছু জানিনা। কোন্ কথা কেমন কোরে বল্‌তে হয় তা'ও জানিনা। গাইলাম। 'কিছু বল্‌বো ব'লে এসেছিলেম্ রইনু চেয়ে না-ব'লে।'

শুধু সেদিন নয়। চিরদিনই না-বলা থেকে গেছে। বারবার বল্‌তে গেছি, কোনোদিনই বল্‌তে পারিনি।

সেদিন সকালবেলায় বসে বসে সেই কথাই ভাবছিলাম। কলেজের পালা শেষ হয়েছে, কোনও কাজ নেই; সারাদিন ব'সে ব'সে নিজের কথাই ভাবি। নিজের কথাই ভাবছিলাম। বুড়ি এসে হাজির।

ঃ "ও ঠাণ্ডাদি, ঐ ছেলেটা তোমার মাষ্টার?"

ঃ "কোন্ ছেলেটা?"

ঃ "ঐ যে গো, লেকে দেখলাম। বাবার সাথে গল্প করলো।"

ঃ "কাকে দেখলি? কে বাবার সাথে গল্প করলো?"

ঃ "ঐ যে, যে ছেলেটা তোমাদের ইংরাজী পড়ায়!"

পরাশর মিত্রকে দেখেছে বুড়ি। হয়তো দু'দিনেই পরাশরবাবুর সাথে ওর ভাব হ'য়ে যাবে! হয়তো কবে আবার কুল খেতে গিয়ে বুড়ি ধরা পড়বে! বুড়ি বড় হবে, আমার মতন বড় হবে। না, না, পরাশরের সাথে ওর ভাব হওয়া চল্‌বেনা। ওকে নিষেধ ক'রে দিতে হবে।

কাঁদছি। মনে মনে কাঁদছি। কেঁদে কেঁদে দিন যাচ্ছে আমার। আমি বিমলদাকে ভালবাসি। বিমলদা দিগন্ত রেখার মতই অপ্রাপ্য। তাঁকে পাবোনা, তবু তাঁকেই চাই। কান্নাই সম্বল আমাব।

ঃ "ও ঠাণ্ডাদি, তোমার নাকি বিয়ে?"

ঃ "বিরক্ত করিস না, যা এখান থেকে।"

ঃ "হ্যাঁ গো। মা বল্‌লেন, তোমাকে দেখতে আসবে।"

বিয়ে? আমার বিয়ে? আমাকে দেখতে আসবে? কে আসবে? সে তো শিশুকাল থেকেই আমাকে দেখছে। তবে, কে আসবে আমাকে দেখতে? কার সাথে আমার বিয়ে? ছোটমাসি, আমারও গতি তোমারই পথে? ভুলে যাবো? বিমলদাকে ভুলে যাবো? তুমি কি ভুলেছো?

না। ছোটমাসি ভোলেনি। মনের মধ্যে গভীর গোপন ব্যথা নিয়ে ছোটমাসির সংসার-জীবন কাটছে। মরেছে, সারাজীবনে ছোটমাসির কান্নাই হয়েছে সার। যেদিন আমাকে প্রথম দেখতে এলো সেদিন জেনেছি ছোটমাসির গোপন ব্যথার কথা।

আমার বিয়ে ঠিক হচ্ছে খবর পেয়ে ছোটমাসি প্রথম শ্বশুরবাড়ী থেকে এলো। দীর্ঘকাল পরে এলো : দীর্ঘকাল থাকবে এখানে। একটু যেন মোটা হয়েছে : সারা শরীরটায় কেমন-যেন ঢল্‌ঢলে ভাব।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামছে। ছাতের উপর দাঁড়িয়েছিলাম : ছোটমাসি এলো ছাতে। অনেকদিন পরে নিরালায় গল্প হোলো তার সাথে।

: "কিরে হেনা, তোর খবর-টবর কি?"

: "আমার আবার কি খবর!"

: "তুই এখন কলেজে-পড়া মেয়ে, তোর কত খবর থাকতে পারে!"

আমার খবর চায়না ছোটমাসি। যার খবর শুনলে সে একটু খুশী হবে তারই খবর বল্‌তে সুরু করলাম। বিমলদা অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়েছেন : কেন ছেড়েছেন, কোন্ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে কলেজ ছেড়ে চলে গেছেন—সব কথাই বল্‌লাম। কত উদাসীন, কত নির্ব্বিকার, কত মন-

মরা হ'য়ে গেছেন বিমলদা, তা'ও বললাম।

: "সত্যি হেনা, তোর বিমলদার বিয়ে হোলোনা কেন ?"

: "বিয়ে করতে তিনি চান্‌না।"

: "তবে যে শুনেছিলাম তাঁর বিয়ের সব ঠিক। সেই-যে ছবি দেখিয়েছিলি তুই ?"

: "কথা হয়েছিলো। বিমলদা সম্মত হন্‌নি।"

চম্‌কে উঠলো ছোটমাসি। গুম্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। অনেকক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ একসময় আঁচলের খুঁট্ দিয়ে চোখ মুছলো।

: "একি ছোটমাসি, তুমি কাঁদছো ?"

: "কই, নাতো !"

: "কেন লুকোচ্ছ ছোটমাসি ?"

: "চোখে কি যেন পড়েছিলো।"

: "তবু লুকোচ্ছ ? না-হয় ছোটই ছিলাম, কিন্তু কিছুই কি জানতাম না ?"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উত্তর দিল ছোটমাসি—

: "সবই যখন জানতিস, তখন এমন প্রশ্ন করছিস কেন ?"

কেন করছি তা' আমিই জানি : আর কেউ জানেনা। একটি কথাই জানতে চাই, এখনও কান্না আসে কিনা ? বিয়ের এতকাল পরে সেই অনেককালের পুরাণো কথা মনে ব্যথা জাগায় কিনা ? বিত্তশালী স্বামী, অনেককালের অদর্শন,

শ্বশুরবাড়ীর নূতন মোহময় পরিবেশ অতীতের ব্যথাকে ভুলিয়ে দিতে কি পারেনা ?

ঃ "এখন তুমি কাঁদো কেন ছোটমাসি ? এখনতো তোমার বিয়ে হ'য়ে গেছে ?"

ঃ "বিয়ে হ'লে বুঝি কান্না ফুরিয়ে যায় ?"

যায়না ? একজনকে ভালবাসার পর আরেকজনকে বিয়ে করলে কান্না ফুরিয়ে যায়না ? সমস্ত জীবনের গায়ে কান্না জড়িয়ে থাকে ? যাকে ভালবাসা যায় তাকে কি ভুলতে পারা যায় না ? তবে আমার কি হবে ? আজ আমার বিয়ে হোলো। আলো জ্বললো, শঙ্খ বাজলো, মালা দিয়ে বরণ করলাম আজ একজনকে। তাকে নিয়ে কি সব অতীতকে ভুলে যেতে পারবোনা ? কেমন ক'রে পারবো ? তা'কেই কি চেয়েছিলাম আমার সমস্ত চেতনায় ? ছোটমাসির সেদিনের আশ্বাস-বাণী ভুলিনি—

ঃ "মনে রাখিস হেনা। যদি কাউকে ভালবেসে থাকিস তবে তা'কে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করিসনা। সমস্ত জীবন জ্বলে পুড়ে মরবি ঃ নীরব জ্বালা। আমাকে বলিস, আমি দিদিকে ব'লে দেবো।"

ভুলিনি ছোটমাসি, তোমার কথা ভুলিনি। তোমার কথামতন কাজ করতেও তো পারিনি ! আমি যাকে ভালবাসি তার কথা তোমাকে বলি কি ক'রে ? এত

ভালবাসো তুমি আমাকে, আর এতবড় শত্রুতা আমি করেছি তোমারই সাথে! কোন্‌মুখে বল্‌বো তোমাকে? আর ব'লেই-বা কি হবে? যাঁকে ভালবাসি তাঁর কাছ থেকে প্রতিদান তো কোনোদিন পাব না! তিনি যে আমার চেয়ে অনেক বড়। তিনি যে ভাবতেও পারেন না একথা। আর একজন ভাল বেসেছিলো আমাকে। প্রতিদানে তা'কে ভালবাসতে আমি পারিনি। আমাকে ভালবেসে অন্যকে বিয়ে করতে হয়নি পরাশর মিত্তিরকে। জীবনের সাথে অভিনয়, মনের সাথে অভিনয়, আত্মীয়-পরিজন সকলের সাথে অভিনয় ক'রে বেঁচে থাকতে হয়নি তাঁকে। তিনিই আমার গুরু, তাঁরই সান্নিধ্যে গিয়ে আমি আমার জীবনের পরম গৌরবকে জেনেছি : আজ এই বাসররাতে তাঁরই উদ্দেশে আমার পরমপ্রণতি জানাই। আমার অন্তরের গহন অন্ধকারে যে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে চিনলাম কি কোরে? জানলাম কি ক'রে যে তিনি আমার বিমলদা? যদি পরাশর মিত্রের সান্নিধ্য না-ঘটতো তবে হয়তো না-জানা চিরকাল অজানাই থেকে যেতো।

না-হয় তা'ই থাকতো। না-হয় কোনোদিনই নিজের অন্তরকে জানতাম না। তা'তে বুঝি শান্তি পেতাম। তুমি কেন এলে আমার জীবনে, তুমি কেন এসেছিলে পরাশর? আমার কাছে এমনি কোরে হার মানবার জন্য কেন

এসেছিলে? নিজে হেরে গিয়ে আমাকে অন্যের কাছে হার-মানিয়ে দিয়ে গেলে?

বুঝি আমারই কথা ভাবতে ভাবতে পথ চল্‌ছিলে সেদিন?

সেদিন ঝড় এসেছিলো বিকেল বেলায়। জানালা খুলে ব'সে ব'সে ঝড় দেখছিলাম। প্রবল-প্রচণ্ড ঝড়ঃ সেই শেলীর ঝড়ের মতন। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা পার ক'রে অনেকরাতে ঝড় থামলো। উৎকণ্ঠায় পথ চেয়েছিলামঃ অনেক রাত হ'য়ে গেছে, বাবা তখনও কলেজ থেকে ফেরেননি। ঝড় থামলোঃ ঝড়ের মতন বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা; সমস্ত চোখে আতঙ্কের ছাপ সুস্পষ্ট। দৌড়ে বাবার কাছে গেলাম।

ঃ "কোথায় ছিলে বাবা এতক্ষণ?"

ঃ "হাসপাতালে।"

ঃ "হাসপাতালে? কেন? কি হয়েছে?"

ঃ "আমার কিছু হয়নি রে। যা' হয়েছে তা' তোর মাষ্টারের। খবর পেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম।"

ঃ "কার কি হয়েছে?"

ঃ "পরাশরবাবু মোটর-চাপা পড়েছেন।"

কাঁদবো। আমি কাঁদবো। চীৎকার ক'রে কাঁদবো। আর একটু হ'লেই আমি সকলের সামনে কেঁদে ফেল্‌বো। কার পাপে এমন হোলো? বিধাতা, তুমি কি আমাকে শুধু পাপ দিয়ে গড়েছিলে?

: "দেখতে যাবি নাকি হেনা?"

: "যাব। আমাকে নিয়ে যাবে?"

: 'আজ তো আর হয় না। কাল কলেজ থেকে ফিরে তোকে নিয়ে যাবো।"

সেদিন রাতে ঘুমুতে পারিনি। সারাবাত শুয়ে শুয়ে ভেবেছি। অনুতাপে দগ্ধ হয়েছি মনে মনে। বাজার আসন ছেড়ে নেমে এসেছিলেন, ধূলোয় তাঁকে আসন দিতে পা বনি কাল কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াবো আহত পরাশর মিত্রেব সামনে! কাঙ্গাল হ'য়ে আছেন তিনি, আমি হ'য়ে আছি কৃপণ। কি করবো, বিমলদাকে তো ভুলতে পারিনা! শুধু ব্যথা পাই, পবাশর মিত্রকে ব্যথা দিয়েছি ব'লে। মনে পড়ে সেই কলেজের বথা, সেই কর্ণমূলে স্পর্শ, সেই অপূর্ব্ব-সুন্দর পড়ানো, সেই ট্রামে দেখা, সেই গড়ের মাঠের সন্ধ্যা! মনে পড়ে, আবও কত কি মনে পড়ে! কতদিনের কত তুচ্ছ কথা কত বড় বড় অর্থ নিয়ে আজ চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। সেই পরাশরবাবু হাসপাতালে,

গুরুতর জখম ঃ তাঁরই সামনে গিয়ে কাল দাঁড়াবো। আমার সব কৃতজ্ঞতা নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হবো। অভিজিৎকে আঘাত দিয়েছি, সে আঘাত তার প্রাপ্য ছিল, তাই তার জন্য কোন অনুতাপ নেই। কিন্তু আকাশের যে চাঁদ ধরিত্রীর চামেলীর গায়ে স্পর্শ দিতে এসেছিলো সে কেন দুঃখ পেলো! যে চামেলী দুয়ারে-আসা চন্দ্রিমাকে পাতার আড়াল দিয়ে বিদায় করলো, সেকি আছে সূর্য্য-সৌরভেরই প্রত্যাশায়? চাঁদের বুকের এ-কলঙ্ক বুঝি কোনোদিনই মুছবেনা। বহু-জন-কাঙ্ক্ষিত সে, সামান্যা একজনের কাছে রয়ে গেল প্রত্যাখ্যাত!

পরাশর সত্যিই বুঝি বহু-জন-কাঙ্ক্ষিত! অন্ততঃ এক-জনের কথা-তো আমি জানি। ভারতীও বুঝি আসবে কাল হাসপাতালে? আমি যাবো সমব্যথা নিয়ে, আর ভারতী যাবে বেদনা নিয়ে।

সকাল হোলো। উৎকণ্ঠায় পথ-চেয়ে-থাকা সকাল। পরাশর মিত্তিরকে দেখতে যাবো। দেখবো, হাসপাতালের বিছানায় নীরব হ'য়ে শুয়ে আছে wild spirit ঃ destroyer and preserver ঃ কথা কইতে পারবে না, তার সব কামনাকে ব্যক্ত করবে দু'টি অপলক চোখের দৃষ্টি দিয়ে। তাকাবোনা, আমি তাকাবো না শুধু নীরবে তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আরোগ্য কামনা ক'রে চ'লে আসবো। বল্‌তে পারবোনা make

me thy lyre, মনে মনে বল্‌বো, ক্ষমা কর—ক্ষমা কর, আমি বিমলদার।

দুপুরবেলায় বসে বসে ভাবছিলাম, হাসপাতালে গিয়ে কি করবো, কি বল্‌বো! বাবা কলেজে গেছেন, ফিরে এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। নানাকথা ভাবতে ভাবতে ঘুম এসেছিলো। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানিনা, ঘুম ভেঙ্গে গেল বুড়ির ডাকে—

ঃ "ঠাণ্ডাদি, ওঠো। বাবা ফিরে এসেছেন।"

ধড়মড় ক'রে উঠে বসলাম। এত তাড়াতাড়ি বাবা ফিরে আসবেন, ভাবিনি। বাবার কলেজ বুঝি তাড়াতাড়ি ছুটি হ'য়ে গেছে! অথবা, আমাকে নিয়ে যাবেন ব'লেই তাড়াতাড়ি কলেজ থেকে ফিরে এসেছেন! ব্যস্ত হ'য়ে গা' ধুয়ে এলাম। তৈরী হ'য়ে নিলাম যাবার জন্য। মনটা কেমন-যেন হ'য়ে গেল ঃ এত বেশী শ্রদ্ধা করি যাঁকে, তাঁকেই আমি প্রত্যাখ্যান করেছি ঃ তিনিই আজ হাসপাতালে শয্যাশায়ী, তাঁকেই আমি দেখতে যাচ্ছি। বাবার ঘরে গেলাম। বাবা শুয়ে আছেন। ডাকবো কিনা, ভাবছি। বাবাই আগে কথা বল্‌লেন—

ঃ "কলেজ আজ আগেই বন্ধ হ'য়ে গেল হেনা।"

ঃ "কেন?"

ঃ "পরাশরবাবু আজ সকাল বেলায় মারা গেছেন।"

চুপ। একেবারে চুপ হ'য়ে গেছি আমি। একমিনিট, দু'মিনিট, তিনমিনিট ঃ দৌড়ে চলে এলাম বাবার ঘর থেকে।

চলে এলাম বন্ধ ঘরের কোণে ঃ আমার সেই পড়ার ঘর। কেউ আজ নেই সে ঘরে। জানালার কাছে গিয়ে বসলাম। বিকেল নামছে মাঠে মাঠে ঃ সন্ধ্যে নামছে মনে মনে। স্তব্ধ ঃ নির্ব্বাক ঃ স্তম্ভিত—আমি কি করি? আমার কানে কি লেগে আছে? আমার পায়ের কাছে কার হাত থেকে বই ছিট্‌কে পড়লো? আমার গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কে নরম নরম কথা বলছে—এই সন্ধ্যায়—এই নির্জ্জন ময়দানে? আমি কাকে চিঠি লিখবো? কে আমাকে ডাকছে? আমি কার ডাকে সাড়া দিতে পারিনা? কাকে আমি গান শোনাবো? কি গান—'এজীবন পুণ্য কর'?

চম্‌কে মুখ তুল্‌লাম। কে যেন আমার গায়ে হাত রাখলো। তাকিয়ে দেখি, ভারতী। কালো চোখের কোণায় চক্‌চক্ করছে জল। কখন এসেছে টের পাইনি। ওকে দেখে আমারও চোখে জল এলো। পরাশরকে আমি ভালবাসতে পারলামনা, কিন্তু ভারতী ভালবেসেছিলো। প্রতিদান পায়নি। ভাগ্যহতা, তোকে সান্ত্বনা দিই এমন ভাষা পাই কোথায়?

: "কাঁদিসনে হেনা, কেঁদে তো তাঁকে ফিরিয়ে আনতে পারবিনা।"

কে কা'কে সান্ত্বনা দেয়। আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে ভারতী? কি ভাবছে ও'? আমি কি পরাশরকে ভালবেসেছিলাম? ভক্তি করেছি তাঁকে। তুই হতভাগী, ভালবেসেছিলি। উপেক্ষা পেয়ে মরেছিস। মেরেছিস তো, পারলিনে তো তাঁকে ধ'রে রাখতে? এত দুর্ব্বল আমি, আমার চেযেও দুর্ব্বল তুই : বাইরে থেকে তোকে এত শক্ত মনে হয়, ভেতরে তুই কত দুর্ব্বল!

: "আমি কাঁদছিনা ভারতী, তুই একটু কেঁদে নে।"

হাসলো ভাবতী, শুক্‌নো হাসি।

: "কাঁদবো না রে, আর কাঁদবো না। অনেক কেঁদেছি এতদিন। চিরদিন আবছা ছিলেন, কোনোদিনই স্পষ্ট ক'রে জানতে পারিনি। তোর প্রশংসা করতেন, সেই প্রশংসা শুনে তোকে হিংসে করেছি। আজ তাই এসেছি তোর কাছে মার্জ্জনা চাইতে।"

মার্জ্জনা। আমি যা' করেছি, তা' যদি শোনে তবে ভারতীই কি পাবরে আমার সব অপরাধ মার্জ্জনা করতে! ওযে কত স্বপ্ন দিয়ে গড়েছিলো পরাশরকে, সেই পরাশরকে আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। পারবে তা' শুনলে আমাকে মার্জ্জনা করতে? সরল মেয়ে ভারতী, অতি সরল। সারল্যই

ওর শত্রু। সরলতার জন্যই পরাশরের মনের গতি ধরতে পারেনি। অনেক স্নেহ পেয়েছিলো, সেই স্নেহের মর্য্যাদা রাখতে পারলো না। ভালবেসে ফেল্‌লো। ফল হোলো উল্টো। পড়াশুনার বিষয়ে যিনি একদিন পরম শুভার্থী হ'য়ে ভারতীর জীবনে এসেছিলেন উপকার করতে, তিনি জানতেও পারলেন না যে কখন অজ্ঞাতে ওর কতখানি অপকার ঘটে গেছে। সারাজীবন হয়তো ওকে দগ্ধ হ'তে হবে। আর কোনও উপায় কি ছিলো না? ভারতীকে ভালবাসতে কি পারতেন না পরাশরবাবু? মানুষের যুদ্ধ বুঝি সেইখানেই? সেই সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত ঐ মনেরই প্রান্তরে মানুষ বুঝি নিরন্তর যুদ্ধ ক'রে চলেছে! তবু নিজের মনকে মানুষ বশ করতে পারলো না। মন যদি যন্ত্র হোতো! মস্ত লোহার দণ্ড দিয়ে লাইনের ফাঁকে দাও একটু চাপ—সরে যাক লাইন—কালীঘাট-মুখো-ট্রামটি গড়েহাটের মোড় থেকে ঠিক চলে যাবে ওয়েলেসলির পথে। একটুও বিদ্রোহ করবেনা। মানুষের মন কেন যন্ত্র হোলো না? না-না, না-হয়েছে, ভালই হয়েছেঃ হ'লে বুঝি আরও খারাপ হোতো!

থেমেছে ভারতী। কথা বল্‌ছেনা। চুপচাপ বসে আছে। আমি কি বল্‌বো, কিছুই যে বলবার মতন কথা খুঁজে পাচ্ছিনা।

চলে গেল। শিথিল চলন ভারতীর। অনেকক্ষণ ব'সে থেকে কোনও কথা না-ব'লে চলে গেল।

বেচারী। ভালবাসলো, বলতে পারলোনা। যাকে ভালবাসলো, সে বুঝলোনা। আরেকজনকে ভালবাসে সে। আমি? আমিও ভালবেসেছি, আজও বল্‌তে পারিনি। যাকে ভালবেসেছি সেকি বুঝবেনা কোনোদিন? কোনওদিনই কি বিমলদা বুঝবেনা আমার মনের কথাটি? গোল পার্কে নীল্‌চে-সাদা আলোগুলি জ্বল্‌ছেঃ অন্ধকার আকাশ। আমার মনের আকাশ? অন্ধকার। কে জ্বাল্‌বে আলো?

মাথার চুলে আদরস্পর্শ। কার?

এসেছেন। এই অন্ধকার ঘরে, এই একলা-থাকা অবসরে, এমন নিরালা পরিবেশে অতি-কাছে অতি-আপন হ'য়ে তিনি এসেছেন। 'সব দুখ অব দূরে গেল'। অনেক দিনের অনেক মৃত্যু সার্থক হোলো বুঝি আজ নূতন জন্মে! আমার কালো চুলের মধ্যে তাঁর আঙুলগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে নাকি? আমার সারাশরীর কাঁপছে কেন? এই তো চেয়েছি, এমনি কোরেই তো তাঁর আসবার কথা! তবে কেন কাঁপছি আমি? চোখ ফেটে জল নামছে কেন? একটু উঠে দাঁড়াতেও তো পারছি নাঃ আমাকে কি একটু তুলে ধরা যায় না? স্বপ্ন যদি সত্য হোলো, আনন্দে কেন উচ্ছল হয়ে উঠছিনা

আমি ? বিমলদা, আমার বিমলদা এসেছেন। চুলে হাত রেখে আদর করছেন। আঙুলে তাঁর বিদ্যুৎ, নিঃশ্বাসে তাঁর মল্লিকা, কণ্ঠে তাঁর—

: "হেনা !"

অতি মৃদু, অনেক ভিজে আবেগভরা কণ্ঠস্বর! আমি কেমন কোরে সাড়া দেবো ? আমার প্রতি নখকোণ, প্রতি লোমকূপ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে : কিন্তু কণ্ঠে কেন সাড়া জাগছেনা ?

: "চলো হেনা, বেড়িয়ে আসি।"

চলবো। আমি চল্‌বো। আমাদের যুগল-চলন সুরু হবে আজকের এই মুহূর্ত্ত থেকে। আর থামবোনা, আর ছাড়বোনা ; হারাই-হারাই ভয়ে আমার বুক কাঁপে। এমনি আহ্বানের প্রত্যাশা নিয়ে কতদিন ধ'রে বেঁচে আছি। যাকে বারম্বার ডেকে ডেকে ফিরেছি, সে আজ আমাকে ডাক দিয়েছে। আমি চল্‌বো।

পাশাপাশি : আমি আর আমার বিমলদা। রাসবিহারী এভিন্যু দিয়ে ট্রাম-বাস্ ছুটছে তীব্র বেগে : পার হ'তে হবে রাস্তা। একটু কি-যেন ভাবলেন বিমলদা : কোনো কথা না ব'লে আমার বাঁ হাতটি টেনে নিলেন নিজের হাতের মধ্যে। শক্ত মুঠিতে শক্ত কোরে ধরা আমার নরম হাত।

ক্লান্ত পাখী অনেকদিনের পর তার নীড় খুঁজে পেয়েছে। চোখ বোঁজা পাখীর মতন মধুর স্বপ্নে বিভোর হয়েছে আমার নরম হাত। সারা-শরীরে আমার বিদ্যুতের প্রবাহ: কথা কই? কথা? খুঁজে পাচ্ছিনা কেন? এতদিন ধ'রে যা'কে চেয়েছি তা'কে যে পেয়ে গেলাম। তবু কথা পাচ্ছিনা কেন? পথ আজ কত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল! চলে এলাম বিড়লা পার্কের নির্জ্জন অন্ধকারে।

কাল বৃষ্টি হয়েছিল। ঘাসের বুকে বুকে আজও সেই বৃষ্টির স্মৃতিমাখানো। খালি পায়ে এসেছি আমি। আধভেজা ঘাসের স্পর্শে কেমন যেন মিষ্টি মিষ্টি ঠাণ্ডা ভাব। সবই ঠাণ্ডা, সবই মিষ্টি: অন্ধকার আকাশে মিটি-মিটি তারা, তা'ও মিষ্টি। বিড়লা পার্কের নির্জ্জনতা, তাও মিষ্টি। গুরুসদয় রোডের বুকে আছ্‌ড়ে-পড়া হেডলাইটের আলো, তা'ও মিষ্টি। সবচেয়ে মিষ্টি ঐ দু'টি চোখ: অপলক দৃষ্টি-ভরা বিমলদার চোখ। সোহাগের সমুদ্র সেখানে, স্নেহাদরের ছল্‌ছলানি উথলে উঠেছে ওখানে—ঐ চোখের তারায় আমার ছায়া ভাসছে বুঝি।

বসেছি দু'জনে। আমি কাঁপছি: কাঁদছি: উত্তাল তরঙ্গ আমার বুকে। বিমলদা চেয়ে আছেন আমার দিকে।

: "হেনা!"

সেই ডাক। আবার সেই আহ্বান। আমার নামের

শব্দে যে এত মূর্চ্ছনা জাগে তা'তো আগে জানিনি। ডাকো, আরও ডাকো, একশোবার ডাকো, লক্ষবার ডাকো। সমস্ত জীবনে আমার ডাক দাও।

ঃ "অত অস্থির হ'তে নেই, হেনা!"

স্থির হ'য়ে বসলাম। ছেড়েছি, সব চঞ্চলতা ছেড়েছি। বলো, আরও কি বল্‌বে ব'লো!

ঃ "একটু সহজ হ'তে চেষ্টা কর।"

সব ভাবনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে সহজ হ'য়ে গেলাম আমি। তুমি কেমন ক'রে বুঝবে বিমলদা, সহজ হওয়া আজ আমার পক্ষে কত কঠিন! সমস্ত চেতনা দিয়ে যাকে কামনা করেছি তা'কে পেয়েছি আজ। সহজ হওয়া, স্থির হওয়া, অসাধ্য আজ আমার পক্ষে। তুমি অপ্রাপ্য, তোমাকে পেলাম; আমি অদেয়, আমাকে দিলাম। একজন চেয়ে পায়নি, প্রাণ দিয়েছে। তুমি চাওনি, চাইলে প্রাণ দিতে পারি। সমস্ত বিশ্বে আজ চঞ্চলতা। মাঠের ঘাসে ঘাসে, আকাশের তারায় তারায়—হেনা আর বিমলদা মুখোমুখিঃ নির্জ্জন মাঠঃ নিবিড় অন্ধকার।

চুপ। শুনতে পাবে! বিশ্বভুবন কান পেতেছেঃ আমাদের আজকের কথা শোনবার জন্য সবাই আজ কান পেতে আছে। কথাগুলি পালিয়েছে, ধরা দেবেনা। বিমলদা তাই নির্ব্বাক।

ঃ "তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনা, হেনা।"

সান্ত্বনা? কিসের? কি বল্‌ছেন বিমলদা? এমন রাত, এত আনন্দ,—তার মধ্যে সান্ত্বনা? কেন? যা' চেয়েছি তাই পেয়েছি। ছোটমাসি যাকে পায়নি, আমি তা'কেই পেলাম। তবে? সান্ত্বনা কেন?

ঃ "কাগজের অফিসে ছিলাম। স্টাফ্‌-রিপোর্টার পরাশরের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে গেল। থাকতে পারলাম না। তোমার কথা মনে পড়লো। চলে এলাম। কি ব'লে তোমাকে সান্ত্বনা দেবো ভেবে পাচ্ছিনা।"

কালো। আবার নিশুতি কালো। যত আলো জ্বলেছিলো, সব নিভে গেল দপ্‌ কোরে। তবে তুমি সেই তুমি নও, যে-তোমাকে আমি এতক্ষণ ধ'রে পাচ্ছিলাম! তুমি আমার সেই বিমলদা? সেই প্রবীণ-গম্ভীর গুরুজন? আমার প্রেমিকের মৃত্যু সংবাদ শুনে আমাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছো? কেন তুমি এলে? কেন আমার চুলে হাত দিলে? কেন হাত ধ'রে রাস্তা পার হ'লে? কেন নিয়ে এলে এই নির্জ্জন পার্কে? লজ্জা হোলোনা তোমার? আজও কি আমি ছোট আছি? হে ভগবান, কেন এমন হোলো? নারীত্বের এমন অমর্য্যাদা কেন তুমি ঘটালে? যাকে ভালবাসতে পারলামনা তা'কেই ভালবাসি ব'লে সবাই

ভাবছে। বিমলদাও তাই ভেবেছেন। কেন? কেন এমন হবে?

ঃ "ভুল।"

ঃ "কি ভুল, হেনা?"

ঃ "আপনার ধারণা।"

চুপ। কথা কইছেন না বিমলদা। সব নীরব। একটা ট্রামও চল্‌ছেনা। মেফেয়ারের বাড়ীগুলি নিস্তব্ধঃ প্রেতপুরী যেন।

ঃ "তোমার কথা আমি বুঝতে পারছিনা, হেনা। তুমি কি পরাশরকে—"

ঃ "শ্রদ্ধা করেছি, মহৎ ছিলেন তিনি।"

ঃ "আর কিছু নয়?"

ঃ "না।"

যেতে হবে। আর নয়। ব্যর্থ আমার অভিসার। দিগন্তের বর্ণাভা দিগন্তেই লেগে থাক। আমি ফিরে যাই আমার ছোট্ট ঘরের কোণে।

ঃ "চলুন বিমলদা, বাসায় ফিরে যাই।"

ঃ "বোসো আরেকটু।"

অসহ্য নীরবতা। গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। আমি চেয়ে আছি আকাশের দিকে। আকাশ? ও নাকি ফাঁকি।

পৃথিবীর বুক থেকে দেখায় কেমন যেন জমাট একটা কিছু : আসলে কিছুই না, সবই শূন্য। এতদিন মনে মনে আকাশ গড়েছি, আজ স্বরূপ দেখছি তার।

: "হেনা, তুমি সত্যই পরাশরকে—"

: "না, না বিমলদা, পরাশরকে নয়।"

: "তবে ?"

: "আর একজনকে।"

আবার চুপ। উঠুন এবার। উঠছেননা কেন ভদ্রলোক? না-উঠলে এবার আমি একাই রওনা হবো।

: "কে সে? আর কারুর সাথে তো তুমি মেশোনি ?"

: "মিশেছি। অনেক মিশেছি। বহুকাল ধ'রে মিশেছি।"

: "তার নামটি বলো।"

: "আপনি বাসায় চলুন এবার।"

নড়া-চড়া নেই বিমলদার শরীরে। লোকটা কি পাথর হয়ে গেল ? আকাশে এত দেখবার কি আছে ? কি দেখছেন নীরব হয়ে ? সমস্ত দেহ-নিঙ্‌ড়ে একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তাঁর।

: "শোনো হেনা, তুমি ফাঁকি দিয়ে বাসায় ফিরতে চেওনা। একটু স্থির হয়ে ব'সে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। শিশুকাল থেকে দেখছি তোমাকে, আমি তোমাকে সুখী দেখতে চাই। ভেবেছিলাম, পরাশরকে তুমি ভালবাসো : আজ অবাক হ'য়ে

জানছি আমার সেই ধারণা সত্য নয়। আমাকে আজ বলো কাকে তুমি চাও? আমাকে লজ্জা কোরো না। বড় ব'লে, দাদা ব'লে সঙ্কোচ কোরোনা। আমি ভুক্তভোগী, আমি জানি ভালবাসার জ্বালা কত। ব্যর্থপ্রেমের দাহনে আমি পুড়ছি সারাজীবন। তোমার ছোটমাসি আজও আমার দিনের আনন্দ, রাত্রির সুপ্তি কেড়ে নেয়; আজও তা'কে মন থেকে দূর করতে পারিনি।"

ঃ "বিমলদা, চলুন, শীগ্‌গীর চলুন ঃ বাসায় চলুন।"

ঃ "আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

ঃ "তবে আমি একাই চল্‌লাম।"

ছুটে বেরিয়ে এলাম পথে। পার্কে আর নয়। ঐ পার্কে আর জীবনে যাবনা। ওখানে গিয়ে কি শুনেছি? আমার বিমলদার মনজুড়ে আজও সেই ছোটমাসি। সেই বিমলদাকে আমি তিল্ তিল্ ক রে ভালবেসেছি। মৃত্যু দাও, মৃত্যু দাও বিধাতা! কেন আমাকে এ-কথা শুনতে হোলো?

ঃ "হেনা!"

বিমলদা পিছনে পিছনে আসছেন। না, সাড়া দেবোনা। আর তাঁর ডাকে সাড়া দেবোনা। সোজা গিয়ে বসবো আমার জানালার পাশে। ছোটমাসি, রাক্ষসী ঃ সব গ্রাস ক'রে রেখেছে।

ঃ "হেনা, শোনো।"

পাশে এসে পড়েছেন বিমলদা। আমি কেন আরও জোরে ছুটতে পারিনা? বাস্‌গুলো, ট্রামগুলো কত আগে চ'লে গেল। ওরা যন্ত্র কিনা, তাই ওরা আগে যেতে পারে। আমি যদি যন্ত্র হোতাম!

ঃ "ছেলেমানুষী কোরোনা হেনা, শোনো।"

কি শুনবো? আবাব কি সেই সর্ব্বনাশা কথা আমাকে শুনতে হবে? সেই ছোটমাসিকে ভালবাসার কথা? নির্ল্লজ্জ, লজ্জাও করেনা একটা বিবাহিতা মহিলাকে ভালবাসার কথা গল্প করতে! আমি-না কত ছোট, আমার কাছে সেই গল্প! ছাড়ুন, কেন আবার আমার হাত ধরলেন এসে? আমার হাতের শিরা-উপশিরা জ্বল্‌ছে। অন্যায় করছেন ভদ্রলোক, আমার হাত ধরা তাঁর অন্যায়।

ঃ "যাকে তুমি চাও তারই সাথে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করবো আমি। আমাকে এই সুযোগটি দাও হেনা।"

সুযোগ? সুযোগ দেবো! তুমি কি আমাকে একটু সুযোগ দিয়েছো? সমস্ত মনটাকে ভ'রে রেখেছো ছোটমাসির স্বপ্ন দিয়ে।

আবার এসে গেল রাসবিহারী এভিন্যু। বাসা এসে গেছে। বাঁচি, আমি বাঁচি; আমার ঘরটিতে ঢুকতে পারলে আমি বাঁচি। কিন্তু সেখানেও ছোটমাসি যদি আসে, সেই রাক্ষসী! তার নিঃশ্বাসে বিষ আছে।

ঃ "হেনা !"

চাপা-উত্তেজিত কণ্ঠস্বর বিমলদার।

ঃ "লজ্জার অবসর নেই হেনা। লজ্জা ক'রে সব হারাবে। কতজন লজ্জা ক'রে হারায়, হারিয়েছে! বড় হয়েছো ঃ কবে শুনবো তোমার বাবা এক অচেনা-অজানার সাথে তোমার বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলেছেন। তখন তুমি কি করবে !"

ঃ "আমি তা'কেই বিয়ে করবো, বিমলদা।"

চলে এলাম আমার ছোট্ট ঘরের কোণে। স্তম্ভিত-হতবাক্ বিমলদা দাঁড়িয়ে রইলেন পথে।

"পথপ্রান্তে কেন রবো জাগি'
ক্লান্তধৈর্য্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি !"

আজ আমার বিয়ে হোলো। মন্ত্রোচ্চারণ হোলো, মালাবদল হোলো, শুভদৃষ্টি হোলো। কত গভীর সে দৃষ্টি। কত প্রত্যয়ভরা চাহনি অবনীশের চোখে!

আকাশের তারা সব অস্পষ্ট হ'য়ে আসছে। আমার বাসররাত ভোর হোলো বুঝি !

আলো জ্বল্‌লো, সানাই বাজলো, হুলুধ্বনি জাগলো পাড়া কাঁপিয়ে—এলো সেই লগ্ন, সেই লগ্নেরই প্রতীক্ষায় বুঝি অনেক ঘুমহারা রাত পার হয়ে গেছে! এই লগ্ন যার জীবনে অজানিত ভবিষ্যতের অর্গল আজ মুক্ত করলো, সে কি ভাবছে? তার মন, সে তো এক বিরাট বিস্ময়! সে বিস্ময়কে কি ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করা সম্ভব? বাসররাত নায়িকার মনে অনেক ছেঁড়া ছেঁড়া কথা, অনেক মধুর অনুভব, অনেক অতীত বেদনার স্মৃতি বহন ক'রে এসেছে। মনে মনে মুখর সে আজ। তার এই মৌন-মুখরতার মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করেছে আমাদের প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার এক আশ্চর্য্য কাহিনী।

প্রতিভা মৈত্রের "বাসররাত" কোনো এক আধুনিকার মিলন-রাত্রির সত্য পরিচয়।